মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিক ধারা-পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি

- এ রাজ্যে বর্তমানে ৬৮ লক্ষ পরিবার সমবায়ের আওতায় এসেছেন।
- সর্বজনীন সদস্যপদ কর্মসূচী বলে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীগুলির ৭ লক্ষ ৬২ হাজার পরিবারকে এ পর্যন্ত সমবায়ের সদস্য করা হয়েছে।
- ১৯৮৬-৮৭ সালে কৃষিজীবীদের ৫২ কোটি টাকা স্বল্পমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। আগের বছর দেওয়া হয়েছিল ৪৩ কোটি টাকা। সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করেছে ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।
- সমবায় বিপণন সমিতিগুলি মূল্য—পরিপোষক কর্মসূচীতে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার গাঁট পাট কিনেছে এবং ২ লক্ষ ৪৮ হাজার মেট্রিকটন সার বিলি করেছে।
- ১৯৮৬-৮৭ সালে ক্রেতা সমবায়গুলি ২০০ কোটি টাকা মূল্যের ভোগ্যপণ্য বিক্রি করেছে।
- মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বাড়ির সমস্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সমবায় আবাসন সমিতিগুলি ১৯,২৮৩টি ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি করেছে।
- আলু রাখার জন্য আছে ৩৫টি সমবায় হিমঘর, সেগুলির মোট ক্ষমতা ১ লক্ষ ২৬ হাজার মেট্রিক টন। আরও ৮টি ইউনিট শীঘ্রই খোলা হবে। বর্তমানে ১৫২৪টি সমবায় গুদাম আছে, সেগুলির মোট ক্ষমতা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (৩) কর্মসূচী অনুযায়ী মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিকটন ক্ষমতাসম্পন্ন ৭০০টির মত গুদাম তৈরি করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

RECENTLY INTRODUCED IN INDIA

TRAZALON CAPSULE 25 / 50 / 100

(Trazodone HCl 25mg. / 50mg. / 100mg.)

Comfortably effective antidepressant

Significantly low profile of side effects

Safer and superior

to

Tricyclic & Tetracyclic antidepressants.

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

C1/2710 G. I. D. C III PHASE

VAPI 396 195, GUJARAT

With best compliments from :

INTAS LAB. PVT. LTD.

7/3, G. I. D. C. Estab. VATVA

AHMEDABAD-382445

Melozine—10mg. / 25mg. / 50mg.
Trazodil—25mg. / 50mg. / 100mg.
Doxin 10mg / 25mg. / 75mg.
Phenytab.

PHARMACIA LABORATORIES

P-28, C. I. T. SCHEME, GARIAHAT ROAD (South)
CALCUTTA-700 031

PRESENTS

List of Items :

1. FLUHEX—Trifluoperazine B.P. 5mg. Trihexyphenidyl H.C.L. U.S.P. 2mg.
2. CHLORFLUHEX—Chlorpromazine H. C. L. I.P. 50 mg. Trifluoperazine H.C.L.B. P. 5mg. Trihexyphenidyl H.C.L. U.S.P. 2mg.
3. FLUHEXETTE—Trifluoperazine B. P. 2·5 mg. Trihexyphenidyl H. C. L. U. S. P. 1mg.
4. REPOISE-25—Thioridazine H. C. L B. P. 25mg.
5. SOPOR-5—Nitrazepam B. P. 5mg.
6. SOPOR-10—Nitrazepam B. P. 10mg.
7. CPZ-25—Chlorpromazine H. C. L. I. P. 25mg.
8. CPZ-50—Chlorpromazine—H. C. L. I. P. 50mg.
9. CPZ-100—Chlorpromazine H. C. L. I. P. 100m.
10. SERAX—Diazepam I. P. 5mg.

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় । ১ । প্রজাতি সংরক্ষণ

মানবিক ভাষার জৈব-সামাজিক উদ্ভব

ও ক্রমবিকাশ । ২ । ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার

নারী ও শিশুবিভাগ :

একবিংশ শতাব্দী না ষষ্ঠ শতাব্দী । ২০ । ক্ষমা মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের কথা : ভাইনোসর বিষয়ে । ২৩ । কে. আমাত্রিয়াজত (সংকলন)

মনোবিদের ভাবনা । ২৭ । মনোবিদ

অবাচিত সাহায্যে ফ্রেন্ডস্ কালচারাল এসোসিয়েশন । ৩১ ।

প্রাচীন মানসিক স্বাস্থ্য—একটি সমীক্ষা । ৩৩ । বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

প্রথা বনাম শাস্ত্র, যুক্তি আইন ইত্যাদি । ৪৭ । প্রসেনজিৎ চৌধুরী

পুস্তক পরিচয় । ৬০ । তপন মল্লিক

১৯৮৭ সালের কুইজো নীতিসমূহ । ৬৪ ।

ঘোষণা

১। পত্রিকার নাম—মানবমন ২। যে ভাষায় প্রকাশিত হয়—বাংলা

৩। প্রকাশনার কাল—ত্রৈমাসিক—(জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর) ৪। দাম—৫০০

৫। প্রকাশকের নাম—ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—১৬, বিধান সরণী, কলি-৬

৬। প্রকাশনার স্থান—১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

৭। মুদ্রকের নাম—ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—১৬ বিধান সরণী—কলিকাতা-৬

৮। প্রেসের নাম ও ঠিকানা—মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩

৯। সম্পাদকের নাম—ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—১৩২/১এ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

১০। স্বত্বাধিকারীর নাম—পাওলভ ইনস্টিটিউট, ১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪।

আমরা এতদ্দ্বারা বিবৃত করিতেছি যে ১৩২/১এ, বিধান সরণী হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস হইতে মুদ্রিত "মানবমন" পত্রিকার আমিই প্রকাশক ও মুদ্রক এবং উপর্যুক্ত ঘোষণা আমার বিশ্বাস ও জ্ঞান অনুযায়ী সত্য। স্বাক্ষর

ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

নিয়মাবলী

১. 'মানবমন' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রতিবছর জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

২. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫'০০ টাকা। বিশেষ অক্টোবর সংখ্যা ১০'০০ টাকা। সডাক প্রতি সংখ্যা ৬'০০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সডাক ২৫'০০ টাকা অগ্রিম দেয়। জানুয়ারি থেকে বর্ষ আরম্ভ।

৩. চেক কেবলমাত্র কলকাতার জন্য। ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার ইত্যাদি PAVLOV INSTITUTE & HOSPITAL অথবা MANABMON-এর নামে প্রেরণ।

৪. এজেন্সী বা ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। কমিশন ২০%।

৫. অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি খরচ না দিলে গ্রাহকদের কাগজ বুক-পোস্টে পাঠান হয়।

পাভলভ ইনস্টিটিউট
১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

মানবমন-এর

উপদেষ্টামণ্ডলী

ডাঃ নীহার মুন্সী ডাঃ কনেজকুমার পাল ডাঃ সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত শ্রীগোপাল হালদার ডাঃ অজিত বেরা ডঃ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডাঃ সন্তোষ দাস ডাঃ দীপক চন্দ ডাঃ নরেন গঙ্গোপাধ্যায় ডঃ বিনায়ক ভট্টাচার্য শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় ডঃ গৌরী পাণ্ডুলী ডাঃ বিভু মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)
ডঃ অরুণাদেবী হালদার ডঃ বেলা দত্তগুপ্তা ডঃ আরকমোহন দাস ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় সংকর চক্রবর্তী বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ক্ষমা মুখোপাধ্যায়।

কার্যকরী সমিতি

সুনীল বিশ্বাস অন্নয় বন্দ্যোপাধ্যায় সরিৎ রায় গৌতম গোস্বামী প্রবীর বিশ্বাস ডাঃ ইন্দ্র সেনগুপ্ত ডঃ অমিতি চৌধুরী সুমিত মৌলিক শ্যামলী দাশগুপ্ত প্রবীর মজুমদার উর্মি মৌলিক ঊষী সেনগুপ্ত

এই সংখ্যার মুদ্রণে : শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

In the service of ailing humanity

☐ SCHIZONIL PLUS TABLETS
Each Tablet Contains :

Trifluoperazine Hcl B. P. equivalent to Trifluoperazine	5mg.
Trihexyphenidyl Hcl USP	2mg.

☐ DELNIL—25 TABLETS
Each Tablet Contains :

Thioridazine Hcl B. P.	25mg

卐 **D. D. PHARMACEUTICALS**

25/7, BURRO SHIBTOLLA LANE,
CALCUTTA-700 038

PHONES :
45-2975 / 45-5229 / 49-3071 / 49-2761 / 49-2712 / 49-2713

With Best
Compliments of

SARKAR PHARMACY

118 C, A. J. C. Bose Road,

Calcutta-700 014

ধরণী গোস্বামী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস-এর কাছে আমাদের ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়। আমরা পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী ও পাভলভ ইনস্টিটিউটের সভ্যরা তাঁদের পূত স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

প্রকাশিত হয়েছে—

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ-এর ২য় খণ্ড

বিচ্ছিন্নতা ও বর্তমান

দাম : ৫০.০০ টাকা (সুলভ সংস্করণ)

„ ৭০.০০ টাকা (গ্রন্থাগার সংস্করণ)

পরিবেশক—

একাডেমিক পাবলিশার্স

কলিকাতা-৭০০ ০৭৯

এই লেখকের তিনটি নাটক—

মরুঝঞ্ঝা অপারেশন ফাটস্টাস কঙ্কাবতীর নাটক

দাম : ১৫.০০ টাকা

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা :

মানবমন্ত্র | ১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

আগামী সংখ্যায় (এপ্রিল-জুন ১৯৮৮)

বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিক বিষয়ক সাক্ষাৎকার

☐ শ্রীগোলাল হালদার ☐ শ্রীমতী অরুণাদেবী হালদার

☐ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এবং আমাদের নিয়মিত বিভাগীয় রচনা

মানবমন

জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৮ : বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১

সম্পাদকীয়

প্রজাতি সংরক্ষণ

দেশের সামনে এই বিশ শতকের শেষ দশকে অনেক সমস্যার সঙ্গে দুটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর্থসামাজিক বলে মনে হলেও সমস্যা দুটিই জটিল এবং মনস্তাত্ত্বিক পুঁচুরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রথম : জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা থেকে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে আগামী শতকে পৌঁছবার আগেই আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে ভেঙে পড়তে পারি। এশিয়ার অন্যান্য দেশের আগে থেকেই আমাদের রাষ্ট্রনেতারা পরিবার নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দিয়েছেন। এই ব্যাপারে ব্যয়বরাদ্দ (আমাদের দেশের আর্থিক সংস্থানের দিক থেকে বিচার করলে) কার্পণ্য করা হয়নি। তবুও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমরা অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এ ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি। কেন আমরা অভীষ্ট লাভে সফল হইনি এ নিয়ে বিভিন্ন কারণ দেখানো হয়েছে। কোনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেটা এখনও বিশেষজ্ঞরা নির্ণয় করতে পারেননি বলেই মনে হচ্ছে। কেন ?

দ্বিতীয় : ঐক্য সংহতি রক্ষার যথাযথ চেষ্টা সত্ত্বেও দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্বেষমনস্কতা ক্রমবর্ধমান। নানারকমের বিচ্ছিন্নতা সঙ্গে আমরা পরিচিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতা লাভের নেশায় মেতে উঠেছেন। নায়কীয় হানাহানির পর ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ দুটুকরো হল। তারপর দেখা দিল ভাষাগত ও আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ। আত্মাহুতি, ছোটবাটো দাঙ্গাহাঙ্গামা ইত্যাদির চাপে রাজ্যের পুনর্বিভাজন ও পুনর্গঠন। চল্লিশ বছর কেটে গেছে স্বাধীনতা লাভের পর। বর্তমান ভারতে ধর্ম ভাষা নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার সমস্যা মেটবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দেশনেতারা নিজ নিজ পার্টি সম্পর্কে সজাগ। নিজের দলকে—তা সে ধর্মভিত্তিক, আঞ্চলিক, ভাষাভিত্তিক, যা ই হোক না কেন,—এক বিশেষ সম্প্রদায়কে ইষ্টান্বেষী বলে জাহির করে বেশ কিছু মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই-এর প্যাঁচ দিতে যথেষ্ট কুশলী ও সচেষ্ট। গোটা দেশের কথা এঁরা চিন্তা

করেন না। 'ভারতীয়' কথাটা পাসপোর্টের কার্ডেই থাকে, পাসপোর্টধারীর মনকে থাকে না। 'হিন্দুস্তানী' কথাটা তবু হয়তো কিছুটা প্রত্যেক উত্তেজ করে এদেরকে মনে, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের কানে কথাটা আদৌ মধুর ঝংকার তোলে না। আকলিক অটোনমির দাবি হয়তো সবলে করেন না, কিন্তু নিজের অঞ্চলের সব ব্যাপারে অগ্রাধিকার-এর জিগির তুলে নির্বাচনে করবা তোলেন। কোনো সময় মনে হয় দেশ বোধ হয় অঞ্চল বা ভাষাভিত্তিক কয়েকটি খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যাবে, আবার যখন পাঞ্জাবের দৈনন্দিন হত্যার ও বীভৎস দিল্লী ওয়াটের খবর কাগজে পড়ি তখন মনে হয় দুই বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায় আর একটি কুরুক্ষেত্রের মাধ্যমে বুঝি আবার ভারত বাবচ্ছেদ ঘটাবে। আর একটি সম্প্রদায়কে দেশের এক প্রান্তে আশ্রিতের-অধিকার দেওয়া হবে। এবার ভিন্নধর্মভিত্তিক ভাগ-বাটোয়ারা ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না।

আমার এই ভয়কে 'একটা মিউরোটিক ফ্রেইট' বলে অনেকে অবজ্ঞা করতে পারেন, কিন্তু নানা রকমের সম্প্রদায়ভিত্তিক বিরোধ-বিদ্বেষকে অস্বীকার করতে পারেন না। বিরোধ ছিল, রয়েছে এবং থাকবে—একথা মনে আওড়ালে আত্মতুষ্টি হতে পারে, কিন্তু দেশব্যাপী বিবাদ-বিসম্বাদ অস্থিরতা দূর হবে না। ঐক্য সংহতির সূত্র আমাদের খুঁজে পাওয়া দরকার, বিশেষ দরকার।

অনেকেই জানেন, এবং বোঝেন যে সমস্যা দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনৈক্য ও অসদ্ভাব বিদ্যমান থাকলে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করতে পারে না। পরিবার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজের সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হ্রাস করে সম্প্রদায়কে শক্তিহীন করতে কেউই চাইবেন না। এই মানসিক কারণকে গুরুত্ব দেয়া চলে না। এছাড়া হিন্দুসম্প্রদায়ের মানুষের মনে বংশের পুত্রসন্তান শুধু ইহলোক নয়, পরলোকের জন্যও প্রয়োজন। বংশবৃদ্ধির তাগিদেই হয়তো দুর্ভিক্ষ মহামারীতে দেশের মাটি থাকলেও মানুষ থাকবে না।

মানবিক ভাষার—
জৈব-সামাজিক উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার

পূর্বানুবৃত্তি :

[মানুষকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে—মানুষের ভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ব্যাপারটি যথাযথ-ভাবে অনুধাবন করতেই হবে। কারণ এই বিষয়টির মধ্যেই মানবিক সত্তার, তথা মানবমনের, সারসত্তা নিহিত রয়েছে। বস্তুত, মানুষের বাক্[১] এবং ভাষা[২] সংক্রান্ত বিবর্তনের ব্যাপারটি মূলগতভাবে নরোৎপত্তি[৩] এবং সমাজোৎপত্তি[৪] নামক 'মজ্জাগি-অভিব্যক্তি'র সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই সংযুক্ত।

"শ্রম-ভাষা-চিন্তা" বিষয়ক ধারাবাহিক রচনাগুলির মাধ্যমে সে কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি। মানবিক ভাষা-বিকাশের জৈব-সামাজিক ভূমিকাটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনেই—পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা 'মানুষের উদ্ভব' বর্ণনা করেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি : 'হোমো' জাতি বা জেনাসের অন্তর্গত যে সমস্ত যূথ[৫] বা 'হরদ'—(দল-বেঁধে) হাতিয়ার ধরা আর হাতিয়ার তৈরি করার কাজগুলোকে সবচেয়ে সার্থক এবং সাংঘাতিকভাবে করতে পেরেছিল, একমাত্র তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে রইলো। এবং কালক্রমে তারাই হয়ে উঠল—যথার্থ হোমো সাপিয়েন্স্ ; অর্থাৎ যুক্তি-বুদ্ধিযুক্ত হোমো। এরাই হল সমগ্র মানবজাতির আদিতম পূর্বপুরুষ। ....

হোমো সাপিয়েন্স্ প্রজাতির ক্রমবিকাশ এবং ধারাবাহিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে, নিত্য-নূতন অস্ত্র-শস্ত্র, এবং শিল্প-সাহিত্যে—যথাযথ উদ্ভাবন, লাগোতার ও বহুল-উৎপাদন এবং ক্রমাগত উন্নতির যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এই সমগ্র-বিকাশের সার্থক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই আমরা বলেছিলাম : সমবেত জীবন-চর্যা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের শ্রমের হাতিয়ার প্রভৃতির উৎপাদন এবং ব্যবহারের প্রয়োজনেই—অর্থাৎ, ক্রমশ জটিল-হয়ে-ওঠা সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের স্বার্থেই—পারস্পরিক 'ভাবগত' আদান-প্রদানের আধার এবং বাহক হিসেবে নানা-প্রকারের ভাষার উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটতেই হবে। কিন্তু কিভাবে ?—সেটাই ছিল আমাদের প্রশ্ন।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাতে চাইছি : গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায়—"শ্রমের হাতিয়ার" এবং "ভাবগত যোগাযোগের হাতিয়ার" স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরকে সাহায্য করেছে।

---

১. speech ২. LANGUAGE ৩. anthropogenesis ৪. sociogenesis

৫. horde (এই পর্যায়েও clan বা গোষ্ঠী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার না করাই ভালো।)

অর্থাৎ, আমাদের দেখাতে হবে: এই দু'রকমের "হাতিয়ার"ই—যুগপৎ মানুষের বিশেষ ধরণের জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে, পরস্পর হাত-ধরাধরি করেই গড়ে উঠেছিল। এবং বর্তমান প্রবন্ধের এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই—পরবর্তী পর্যায়ে—আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, এই সমগ্র সমাজ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানবিক যুক্তি-বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছিল। এবং এই পথেই—একদিকে ভাববাদ এবং অন্য দিকে যান্ত্রিক জড়বাদের বিরুদ্ধে যান্ত্রিক-ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক সংগ্রাম যথার্থ তাৎপর্যে মণ্ডিত হবে। অর্থাৎ, সমগ্র প্রাকৃতিক জগতের যান্ত্রিক বিকাশ-সম্পর্কীয় বিশ্লেষণ থেকেই মানব-সমাজের যথাযথ বিবর্তনের ধারাটি প্রকৃত অর্থে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। এবং প্রমাণিত হবে যে, মানবিক চিন্তার বিবিধ 'ভায়ালেকটিক'—মহ-প্রকৃতির অন্তরঙ্গ—প্রাকৃত-সামাজিক যান্ত্রিকতারই বিভিন্নমুখী প্রতিফলন: "শ্রম→ভাষা→চিন্তা" সংক্রান্ত পর-পরিক্রমাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে—গণিত মাত্র এবং কর্যাল লজিকের সমস্ত রকমের বিকাশ মূলতঃ যন্ত্রবিজ্ঞানেরই অঙ্গ। একটুখানি রহস্যময় তাত্ত্বিক ভাষায় হয়তো বলা যাবে যে: "প্রাকৃত-ব্রহ্মে"র[৩] অন্যান্য স্থিতি-গতির খেলা থেকেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত রকম ভাষা এবং চিন্তার জন্ম। অতএব 'শব্দ' অবশ্যই 'ব্রহ্ম'!

["অগ্রগামী রথ" থাক্। আপাতত প্রায় দশ লক্ষ বছর পিছিয়ে গিয়ে, আসুন আমরা প্রাকৃতিক রঙ্গমঞ্চের পর্দাটি আবার তুলে ধরি।]

১.

মানুষের ভাষা গড়ে ওঠার জন্যে সবচেয়ে প্রথমেই দরকার ছিল—দুটো উপাদানের: প্রথমত, যথেষ্ট বিকশিত বাক্‌যন্ত্র। এবং দ্বিতীয়ত, সেই বাক্‌যন্ত্রকে প্রয়োজনমতো পরিচালিত করার উপযুক্ত 'মানবিক' মস্তিষ্ক। সুতরাং, পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিকাশ রূপেই তাদের বর্ণনা করতে হবে।

১. বাক্-তন্ত্রের বিকাশ

জৈব-অভিব্যক্তির প্রক্রিয়াতে যে সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী মোটামুটিভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরে-ছিল, তাদের অগ্রাঙ্গ অন্যদের চেয়ে অনেক ভালোভাবেই বেড়ে উঠেছিল। হাতের কাজের গুণে মানুষের আদিতম পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘটল। কারণ পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারার ফলে—ঐ আদি-মানুষদের ক্ষেত্রে, অগ্রাঙ্গের ওপর ঝুঁকে-পড়া মাথার চাপ ক্রমে-ক্রমেই বিলুপ্ত হল। প্রধানত সেজন্যেই গলার আওয়াজ-ও ক্রমশ 'খুলে' গেল। তার মানে, অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর চেয়ে এরা অনেক ভালোভাবে—নানা রকমের, নানা সুর ও স্বরগ্রামের

---

৩. ব্রহ্ম≡গতি, শক্তি, শব্দ—সমগ্র সম্ভবত, ব্রহ্ম/ব্রহ্‌মা প্রভৃতি শব্দ 'ভলি' তথাকথিত আর্য ভাষা গোষ্ঠীর থেকেও অনেক প্রাচীন। এমনো কি হতে পারে যে—ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে—মধ্য-প্রাচ্যের the Great Mother Goddess (মক্কাম্বা ?) ব্রহ্মেরও জননী ? ভাবগতভাবে হলেই বা অসুবিধে কি ?

আওয়াজ বের করতে লাগল। বন বেঁধে খাদ্য-সংগ্রহ এবং শিকার করতে গিয়ে, আর শিকার প্রভৃতির জন্যে নানারকম হাতিয়ার ধরতে এবং বানাতে গিয়েও—এরা সেইসব আওয়াজ বিভিন্নভাবেই ব্যবহার করতে আরম্ভ করল।

[অবশ্য মনে রাখা দরকার যে অবয়ব[৭] এবং ক্রিয়া[৮] পরস্পর-প্রভাবী, গতিশীল (অর্থাৎ, বিকাশ-মান) 'জৈব' হিসেবেই ক্রমোন্নতি লাভ করতে পেরেছিল।]

কিন্তু মানুষের ভাষাগত মৌল ধ্বনিসমূহ[৯] বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, তাদের উৎপাদনে শুধু স্বরযন্ত্রের কাজই যথেষ্ট নয়। কারণ, স্বরতন্ত্রীগুলোর মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হলে—কয়েকটি মাত্র স্বরধ্বনি প্রাথমিকভাবে উৎপন্ন হয়। সবকটি স্বর পরিষ্কারভাবে বের করতে হলে, এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হলে—আলজিভ, জিভ এবং ঠোঁটদুটোকে নানা-ভাবে কাজে লাগাতেই হবে। তাছাড়াও মুখ-গহ্বরের বিভিন্ন অংশের বিশেষ মানসিক গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন: ক-খ প্রভৃতি জিহ্বামূলীয় বর্ণ, চ-ছ প্রভৃতি তালব্যবর্ণ এবং ট-ঠ প্রভৃতি মূর্ধন্য বর্ণ উচ্চারণ করার জন্যে জিহ্বামূল, তালু, মূর্ধা ইত্যাদির সাহায্য অপরিহার্য। আবার ত-থ প্রভৃতি দন্ত্যবর্ণ অবিকৃতভাবে উচ্চারণ করতে হলে জিভের ডগাটি দাঁতের ওপরপাটির সঙ্গে বিশিষ্ট-ভাবে মেলাতেই হয়। বস্তুত, মানবশিশুর দ্বারা উচ্চারিত ৭২টি মৌলধ্বনির ক্ষেত্রেই এ ধরণের ব্যাপার রয়েছে।

সুতরাং ধ্বনিবিজ্ঞানের[১০] বিশদ আলোচনায় না গিয়েও আমরা বলতে বাধ্য যে—মোটামুটিভাবে যথাযথ কোন একটি মানবিক ভাষায় পৌঁছাতে হলে ভাবী মানুষের মুখ-গহ্বরের মধ্যেও অনেক পরি-বর্তনের দরকার ছিল। এবং আমরা বলব—এখানেও হাতের বহু হাতিয়ারের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: হাতের কাজের সুবাদেই হাতিয়ারের আগমন এবং উন্নতি। আবার নানা রকম হাতিয়ারের ব্যবহার ক্রমশ খাদ্যের অভ্যাস বদলের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার প্রক্রিয়াকেও পালটে দিয়েছিল। যেমন মাংস খাওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাভাবিক মাংসাশী প্রাণীদের মতো আদি বানর-মানুষেরাও নিহত প্রাণীর মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে-ছিঁড়েই খেত। কিন্তু পাথরের 'ছুরি' দিয়ে মাংস এবং (প্রয়োজনে) অন্যান্য খাদ্যকেও টুকরো টুকরো করে কাটার অভ্যাস তৈরী হল। এর ফলে চোয়াল এবং দাঁতের গঠনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। মুখ গহ্বর তাই প্রশস্ত হল; এবং জিভের নড়া-চড়াও ক্রমশ সহজ হয়ে উঠল।

বস্তুত, হাতের নানারকম কাজ-কর্মের যৌলতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াতেই বিভিন্ন ধরণের খাদ্য সংগ্রহ এবং গ্রহণের অভ্যাস—এই বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীদের সমগ্র দেহের সঙ্গে সঙ্গে মোটা মুখ-মণ্ডলের আকৃতিও বংশপরম্পরায় ক্রমাগতই পালটিয়ে চলেছিল। প্রায় এক লক্ষ বছর আগে—আগুনের ব্যবহার শুরু হবার ফলে, কাঁচা মাংসের বদলে ঝলসানো মাংস খাওয়ার রেওয়াজ গড়ে উঠল। তাতেই চোয়াল আরো দুর্বল হয়ে গেল এবং দাঁতগুলোও অনেক ছোট হতে লাগল। সুতরাং

৭. structure ৮. function ৯. phonemes ১০. phonetics

মুখের মধ্যে জিভের নড়া-চড়া আর ঠোঁটদুটোর ক্ষমতা আরো বেড়ে গেল। [জৈবিক বিচারে—আজনও এক ধরনের "হাতিয়ার" !]

সুতরাং প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং শারীরবৃত্তীয় তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে—একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মুখবন্ধ শ্রবের মাধ্যমেই মানুষের সমগ্র বাক্‌তন্ত্র ভাষা তৈরি-হবার প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এবং কাজের প্রয়োজনে তার ব্যবহারও হচ্ছিল। অর্থাৎ, কাজ-কর্মের অনুষঙ্গে মানুষের ভাষা নয়োৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদিত হতে আরম্ভ করেছিল—ধ্বনি-বৈচিত্র্যের ব্যবহারিক সার্থকতায়। বস্তুত, এই সার্থকতাই অর্থপূর্ণ মানবিক ভাষা-বিকাশের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

২. গুরুমস্তিষ্কের বিকাশ

অবশ্য 'অর্থ', অর্থাৎ 'মানে'র ব্যাপার, নিয়ে কোনো বিশদ বিশ্লেষণে এখনই যাচ্ছি না ; কারণ বিষয়টি বহু বিতর্কিত। তবে, প্রাথমিকভাবে আমরা বলে রাখছি যে, মূলত ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টির ব্যবহারিক সার্থকতার ভিত্তিতেই তাদের 'অর্থ' নির্ধারিত হতে পেরেছিল। অর্থাৎ, গোষ্ঠীবদ্ধ আদি মানুষদের বিশেষ ধরনের জীবনচর্যার মাধ্যমে—বাস্তব জগতের বিভিন্ন বিষয় এবং ঘটনার সঙ্গে তাদের নানারকম ধ্বনি-বিন্যাসের বিবিধ-বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। সমবেতভাবে সেই সম্পর্কগুলো মেনে চলার ক্রম-সচেতন অভ্যাসই কাজকর্মের ক্ষেত্রে বেশি বেশি সাফল্য এনে দিয়েছিল। 'অর্থ', শব্দবন্ধ এবং বাক্যের অর্থ, ঠিক এই পথেই নির্ধারিত হতে শুরু করেছিল।

কিন্তু অর্থপূর্ণ ধ্বনি-সমষ্টির বিকাশ ঘটতে হলে উন্নত বাক্‌-তন্ত্রের সঙ্গে ক্রমোন্নত গুরুমস্তিষ্কের সুগভীর সামঞ্জস্য গড়ে ওঠারও প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, মানব-গোষ্ঠীগুলোর বিশেষ ধরনের জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে—একদিকে যেমন বাক্‌তন্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়েছিল, আর একদিকে তেমনি ক্রমশ-জটিল হয়ে-ওঠা গুরুমস্তিষ্কের অগ্রগামী সংযোগ এবং সমন্বয়ী ক্রিয়াকলাপও ছিল অপরিহার্য।

আমরা জানি—যেকোনো প্রাণীদের ক্রমবিকাশে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র [১১] ধীরে ধীরেই গড়ে উঠেছিল। মাছ, সাপ ইত্যাদির কথা বাদ দিলে—ক্রমশ বিশদ ধ্বনিতরঙ্গ[১২] অভিব্যক্তির ধারাতেই গড়ে উঠছে। পক্ষী কুল এবং স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে বিশদ আওয়াজ করার ক্ষমতা পর্যায়ক্রমেই বেড়েছে। হোমিনিডদের বেলায় এই ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ছিল। হোমো সাপিয়েন্‌সদের সুসম্পর্কীয় জ্ঞাতিগুষ্ঠির মধ্যে হোমিনোইডিয়া পরিবারের 'পংগিডি' গোত্রের যে সব বনমানুষ এখনো টিঁকে রয়েছে, সেই গোরিলা এবং শিম্পাঞ্জীরা অন্যান্য নীচুস্তরের প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মৌলিক আওয়াজ করতে পারে। এদের ধ্বনিগত সামর্থ্যের ভিত্তিতে একটা অর্থপূর্ণ ভাষা থাকলেও থাকতে পারত। অথচ তাদেরও—প্রকৃত মানবিক অর্থে—কোনো ভাষা নেই। কিন্তু, কেন নেই ?

এই 'কেন'-র জবাব দিতে হলে মানবিক গুরুমস্তিষ্কের এবং প্রধানত গুরুমস্তিষ্ক বল্কলের, বৈশিষ্ট্য

---

১১ প্রধানত, বিভিন্ন অংশযুক্ত মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জু।

১২ নানারকম আওয়াজ করার ব্যবস্থা।

ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং অভিব্যক্তির দিক থেকে দেখা যাবে যে, সেখানেও মানুষের যুথবদ্ধ জীবন-চর্যাই সেদব বিশিষ্টতার জনক :

(ক) প্রাণীর 'অবয়ব' এবং 'অবস্থান'-এর মধ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই স্নায়ুতন্ত্রের আবির্ভাব : এর একটি অংশ অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ পরিচালনা করে। অন্য অংশটি দেহের বাইরেকার জগতের সঙ্গে অভিযোজন করতে সাহায্য করে। এদের মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ রয়েছে। তা না হলে ভেতরের জগৎ আর 'বাইরের জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়! আর এই সব যোগাযোগের মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই জটিলতর দেহ-সংস্থানে 'সপারিষদ' গুরুমস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ ঘটেছে দ্রুততর লয়ে। তার ফলে প্রধানত চেষ্টিত কার্যকলাপ এবং সংবেদনী ক্রিয়াকাণ্ডের সমন্বয় জটিলতর হয়ে উঠেছে। ফলে, অভিজ্ঞতা এবং কাজের মধ্যে মিল রাখা সম্ভব হয়েছে অনেক বেশি করে।

(খ) [পূর্ববর্তী প্রবন্ধেই দেখানো হয়েছে যে—] হাতের বিশিষ্ট গঠনের ফলেই মানুষের বৃক্ষবাসী পূর্বপুরুষদের মধ্যেই মস্তিষ্কের শক্তি অন্য প্রাণীদের চেয়ে বেশি বেড়ে গিয়েছিল। ...পরবর্তী পর্যায়ে মাটিতে নেমে আসার জটিলতর অবস্থায় এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল—হাতের কাজের গুণেই।... বাকৃতন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে—অগ্রগামী যৌথ জীবনযাত্রার মাধ্যমে, গুরুমস্তিষ্কের বল্কের চেষ্টাকেন্দ্র এবং সংবেদনী কেন্দ্রগুলোও জোরালো হয়ে উঠেছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেতরকার অনুষঙ্গ এলাকাগুলোর জটিলতাও বেড়ে গিয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় যৌথকর্মের সঙ্গে একদিকে প্রাক্তন অভিজ্ঞতা এবং আরেকদিকে ধ্বনি-সমবায় সম্মিলিত হতে পেরেছে।

(গ) মস্তিষ্কের ক্রমোন্নতির মধ্যে দিয়ে—যেরূপটী। প্রাণীজগতেই 'সংবেদনী-মুদ্রণ' সঞ্চয় করে রাখার শক্তি ধারাবাহিকভাবে বাড়ছিল। এবং সেই প্রক্রিয়াতে প্রত্যক্ষণ-ক্ষমতা গড়ে উঠছিল। অর্থাৎ আগেকার কোনো অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হলে—মোটামুটিভাবে উচ্চতর প্রাণীরা ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী প্রভৃতি চিনতে পারছিল। প্রত্যাভিজ্ঞার এই ক্ষমতার সঙ্গে তথাকথিত 'ভাবস্মৃতি' বা প্রতিরূপ-গঠনেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আসলে গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন সংবেদনী কেন্দ্রের বিশ্লেষণী-সংশ্লেষণী কার্যকলাপের মাধ্যমে ক্রমশ নূতনতর প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হওয়ার ফলেই তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষণ ঘটে। তবে সাদা কথায় আমরা সংবেদনী মুদ্রণের মাধ্যমে প্রতিরূপ গঠিত হবার কথা বলতে পারি।

(ঘ) ঐ রকম একটু সাদামাটা ভাবেই বলছি যে এক একটি প্রতিরূপ পৃথক ভাবে পুনরুজ্জীবিত হবার ফলেই স্মৃতির প্রকাশ সম্ভব হয়। এবং সেই স্মৃতির ব্যাপারটি উচ্চতর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কম-বেশি পরিমাণে সকলেরই আছে। হোমিনিড গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে স্মৃতির উপাদানগুলোকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেবার জন্যে 'কল্পনা' জাতীয় একটা ক্ষমতা ধীরে ধীরেই লক্ষিত হয়ে চলেছিল। এবং তার পেছনেও ছিল বাস্তব জগতের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বেঁচে থাকার প্রয়োজন।

(ঙ) আদি মানুষের ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে হাতিয়ার ধরা এবং হাতিয়ার তৈরি করার জটিল প্রক্রিয়াতে কল্পনার 'শক্তি' বেড়ে গেল। তার ফলে অতীতের নানারকম সমবেত কাজকর্মের অভিজ্ঞতা, তার থেকে উৎপন্ন স্মৃতির সঞ্চয় এবং হাতিয়ার নির্মাণের অভ্যাস প্রভৃতির ভিত্তিতে নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি এবং উপায় উদ্ভাবন করার ক্ষমতাও বেড়ে গেল।

ব্যাপারগুলো একদিনে-দুদিনে বা দু-চার জনের "যান" থেকে সম্ভব হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে বহু মানুষের সমবেত কাজকর্ম ছাড়াও, শিকার প্রভৃতির আগে প্রস্তুতিমূলক অভিনয়-ধর্মী "নাচ-গান" এবং সেগুলোর স্মৃতি—এইসব নানা উপাদান মিলেমিশেই শুরুমস্তিষ্ক-বল্কলের বহুমুখ এলাকাগুলোর কল্পনাধর্মী শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে।...

এই সুদীর্ঘ বিকাশের ফলে শুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল। এবং সেই পরিবর্তনই অর্থপূর্ণ ভাষাধিকাশের মাধ্যমে আদি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে 'মানুষের পর্যায়ে' পৌঁছে দিয়েছিল।

বিভিন্নমুখী পরিমাণগত পরিবর্তনের সামগ্রিক সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে যে মৌলিক গুণগত পরিবর্তন আদিতম মানুষের জীবনে ঘটে গিয়েছিল, তাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে—একটি শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অপরিহার্য। কারণ তা না থাকলেই—শুরুমস্তিষ্কেরও পরিচালক হিসেবে, কোনো একটা "কুতুরে শক্তি" স্বীকার করার প্রবণতা থাকে। ঠিক এই বিষয়টির 'দারপ্রান্তে এসে' ফিরিয়ে এনেলস্ একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব ঘোষণা করেছিলেন। এবং এই তথ্যগত ব্যবধানের মীমাংসায় ইভান পাভলভের অবদান অনস্বীকার্য। শুরুমস্তিষ্কের কার্যকলাপ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমস্যা এখনো আছে। কিন্তু পাভলভের পর থেকে শারীরবিজ্ঞান (এবং মনোবিজ্ঞান) দৃঢ় পদক্ষেপেই এগিয়ে চলেছে।

২.

১. প্রথম সংকেততন্ত্র

মানবিক চেতনার স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পাভলভের অবদান খুব সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হলে—শিশুর দেহ-মানস বিকাশের মাধ্যমে, তার ভাষাশিক্ষার দিকটি বিশ্লেষণ করাই সবচেয়ে সুবিধাজনক:

মাতৃগর্ভে থাকার সময় স্বাভাবিক শিশু (প্রায়) সাড়ে ৯' মাসে সমগ্র জৈব-অভিব্যক্তির লক্ষ লক্ষ বছরের শারীরবৃত্তীয় যাত্রাপথ খুবই সংক্ষেপে পার হয়ে আসে। ঠিক তেমনি করেই প্রথম ২।৩ বছরের মধ্যে সে হোমোসাপিয়েন্স্ প্রজাতির বিশদ বিকাশের পর্বটিও পাড়ি দেয়।...

সদ্যোজাত শিশু তার আচরণের দিক থেকে 'নিছক' একটি প্রাণী। তবে তার মধ্যে মানব-প্রজাতির উচ্চতর আচরণগুলোর স্নায়বিক সম্ভাবনা অবশ্যই নিহিত থাকে। এই পর্যায়ে শিশু—খুব খিদে পেলে কাঁদে; আবার বেশি ব্যথা দিলেও কাঁদে। অন্যান্য প্রাণী মাত্রকের ক্ষেত্রে ক্ষুধা কিংবা বেদনার প্রতিক্রিয়া কিছু কিছু ভিন্ন হলেও মূলত এক রকম। অর্থাৎ, শারীরবৃত্তের দিক থেকে প্রতিক্রিয়া ঘটার ভিত্তি মোটামুটিভাবে একই। এবং এ ধরণের কাজগুলো যে স্নায়বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে, পাভলভ তার নাম দিয়েছেন—শর্তহীন বা স্বাভাবিক (বা স্বভাবজ) পরাবর্ত[১০]। অর্থাৎ, ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কাজগুলো হল জন্মগত সম্পদ। একেবারে নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে শুধু এদের মাধ্যমেই সব কাজ

১০ unconditioned or natural reflex.

চলে। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে—অভিব্যক্তির ধারায় প্রতিক্রিয়াগত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব-শিশুও সেসব জটিলতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

সেজন্যেই জন্মের কয়েকদিন পর থেকেই দেখা যায়—শিশুর আচরণের ধরণ-ধারণ খুব দ্রুতবেগে পালটে যাচ্ছে। যেমন—প্রথম থেকে বেশি মিষ্টি দিয়ে দুধ খাওয়ার অভ্যাস করানোর পর, (প্রায়) মাস খানেক বয়সের একটি শিশুকে যদি একেবারে মিষ্টি ছাড়া দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সে বিরক্ত হচ্ছে; খেতে চাইছে না। আচরণের এই পরিবর্তনের কারণ হল—সর্তাধীন পরাবর্ত[১৪] প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বস্তুত, সমস্ত অভ্যাসলব্ধ ক্রিয়াই এ রকমের সর্তাধীন পরাবর্ত মূলক।

খাওয়ার ক্ষেত্রে শিশুর পক্ষে স্তন্যপান করাটাই হল একেবারে জন্মগত, স্বাভাবিক (অর্থাৎ, সর্তহীন) পরাবর্ত সম্বাবেশ। (সাবেকী ভাষায় একে সাহজিক ক্রিয়া[১৫] বলা হয়ে থাকে।) সুতরাং একথা স্পষ্ট যে বিস্কুট বা বোতল প্রভৃতির মাধ্যমে খাওয়ার অভ্যাস সর্তাধীন পরাবর্ত মূলকের সাহায্যেই সম্ভব হয়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন ধরণের জটিলতা-সম্পন্ন সর্তাধীন পরাবর্ত কোনো-না-কোনো সর্তহীন পরাবর্তের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে: অর্থাৎ, একটি 'স্বাভাবিক' (সর্তহীন) উদ্দীপকের সাহচর্যেই 'আরোপিত উদ্দীপকটি' একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। সুতরাং, সর্তাধীন পরাবর্ত-ক্রিয়ার মাধ্যমে মানবশিশুর মধ্যে যে সব উন্নত প্রাণীসুলভ আচরণ বিন্যাস গড়ে ওঠে, তাদেরই প্রথম সংকেততন্ত্রের কার্যকলাপ বলে গণ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে আরোপিত উদ্দীপকটি—দ্বারবিরোপিত অভ্যাসের মাধ্যমে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সংকেত হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াতেই মোটামুটিভাবে উন্নত প্রাণীরা বিভিন্ন ধরনের নতুন আচরণে অভ্যস্ত হয়; স্মৃতিগত প্রত্যভিজ্ঞাও এভাবেই গড়ে ওঠে। মানবশিশুও এই কৌশলে লোকজন, জিনিসপত্র চিনতে পারে বা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় খেতে শেখে।

২. দ্বিতীয় সংকেততন্ত্র

অন্য কোনো প্রাণী এই পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের বিশদীকরণের বেশি আর এগোতে পারে না। এমনকি, গোরিলা বা শিম্পাঞ্জীদের ক্ষেত্রেও নতুন কোনো পর্যায় গড়ে ওঠে না। মানুষের সেই নতুন পর্যায়টিকে নাম দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্র। একমাত্র হোমোসাপিয়েন্স্ প্রজাতি এই পর্যায়ে পৌঁছোতে পেরেছে। এবং সমস্ত রকম ভাষা গড়ে ওঠার চাবিকাঠি এখানেই নিহিত রয়েছে। স্বভাবতই শিশুর ভাষাশিক্ষার ব্যাপারটিও এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সংকেত-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে আমরা আবার শিশুর দুধ খাওয়ার কৃত্রিম একটি অভ্যাসের উল্লেখ করছি:

বোতলে দুধ খেতে অভ্যাস করার কিছুদিন পর থেকেই দেখা যাবে যে শিশু বোতল দেখলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি 'বোতল' কথাটি বারবার শোনানো হয়, তাহলে দেখা যায়—শুধু

---

১৪ conditioned reflex.

১৫ instinct

'বোতল' বললেই শিশু চকমতা প্রকাশ করে। সংকেত বিজ্ঞানের[১৬] ভাষায় আমরা বলব—বোতলের ব্যবহারটি যেভাবে মানুষের সংকেত হয়ে ওঠে; প্রায় একই রকম ভাবে 'বোতল' শব্দটি হয়ে দাঁড়ায়—বোতল নামক জিনিসটির সংকেত। অর্থাৎ একটি বিশেষ ধ্বনি, প্রথম সংকেতটির সংকেতে পরিণত হয়। "অর্থের অর্থ", মূলগতভাবে, এই ব্যাপারটির ওপরেই নির্ভর করে।

৩. 'শারীরবৃত্ত' এবং 'সমাজবৃত্ত'

উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও ধ্বনিগত সংকেতের কিছু কিছু নজির পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে—প্রথম সংকেতস্তরের বিশ্লেষণ যাবে গুণগতভাবে নতুন কিছু ঘটে না। এবং সেজন্যেই—'ধ্বনি' (বা সাউন্ড) কখনোই 'শব্দ' (বা ওয়র্ড) হয়ে উঠতে পারে না। তার কারণ যা যা ঘটতে হলে—অভিব্যক্তির দিক থেকে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে: একটি হল মানুষের ব্যক্তিগত শারীরবৃত্তীয় বিকাশের দিক; এবং অপরটি মানব-প্রজাতির সামাজিক অভিব্যক্তির ব্যাপারে। [অবশ্য আমরা প্রথম থেকেই বারবার বলেছি যে—উল্লিখিত দুটি বিষয়কে কখনোই বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হিসেবে দেখা চলবে না। মনোৎপত্তি এবং সমাজোৎপত্তির ঘনিষ্ঠতম বাস্তব সম্পর্কের কিস্তিতেই বলতে হবে যে—সমাজ ইতিহাসকে বাদ দিয়ে, এবং মূলত সমাজসম্পর্কের বাইরে ব্যক্তি মানুষের প্রাত্যহিকতার[১৭] আলোচনা একেবারেই অর্থহীন।]

দ্বিতীয় সংকেত স্তরে শারীর-স্নায়ুগত অংশগুলি হল নিম্নরূপ:

(ক) ব্যক্তি মানুষের গুরুমস্তিষ্ক-বল্কলের মধ্যে বাকতন্ত্রের পেশিগত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র অর্থাৎ বাক্‌চেষ্টাধিষ্ঠান (ব্রোকার এলাকা—ব্রডম্যান ৪৪) আর তার পাশাপাশি অবস্থিত বাক্‌চেষ্টাঘটিত সংবেদনী এলাকা যথা অক্ষলের শ্রবণকেন্দ্র এবং তার সঙ্গে অন্যান্য সংবেদনকেন্দ্রগুলির (বিশেষ-, দর্শনকেন্দ্রের) যাতায়াতি অনুষঙ্গ অক্ষলে "শব্দার্থ-উপলব্ধি কেন্দ্র" (ভের্নিকের এলাকা-ব্রডম্যান ৪১-৪২); 'ব্রোকার এলাকা' এবং 'ভের্নিকের এলাকার মধ্যে অন্তর্বর্তীণ সংযোগকারী অনুষঙ্গ অক্ষল হিসেবে নীলদনের এলাকা (ব্রডম্যান ৩৭)। বলাই বাহুল্য—এ সবগুলি এলাকাই হল মোটামুটিভাবে মানবিক গুরুমস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য।

উল্লিখিত শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের ফলেই মানব-শিশুর ক্ষেত্রে ভাষাশিক্ষা সম্ভব হয়। ক্রিয়াগত দিক থেকে মানবীয় গুরুমস্তিষ্কের ভাষাগত সম্পর্কের মূল কথাটি কিন্তু অত্যন্ত সহজ: প্রধানত, কানে-শোনা একটি আওয়াজের প্রতিক্রিয়া (এবং পরে মুদ্রণ) অন্য এক বা একাধিক জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়ার (এবং পরে মুদ্রণের) সঙ্গে মিলে নতুন একটি জটিলতর প্রতিক্রিয়া (এবং পরে মুদ্রণ) উৎপন্ন করে। পরবর্তী পর্যায়ের সেই মুদ্রণকে সাধারণভাবে শাব্দিক প্রতিরূপ[১৮] বলা হয়ে থাকে। এই শব্দগত প্রতিরূপ গঠিত হবার জন্যে ধ্বনি-সংবেদন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই দেখা যায় যে জন্মগত

---

১৬ semiotics-এর

১৭ individuality.

১৮ verbal image

ভাবে সম্পূর্ণ বধির শিশুর পক্ষে ভাষা-শিক্ষা সাধারণ প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। তবে, সমাজে বাস করলে মানবিক ইশারা-ইঙ্গিতের ভাষা সে নিজে থেকে নিয়ে নেয়। এবং বিশেষ পদ্ধতিতে তাকে ভাষাও শেখানো যায়। সে সব ক্ষেত্রে (প্রথমত) দৃষ্টিশক্তি তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। একই সঙ্গে বধির এবং দৃষ্টিহীন হলে—স্পর্শ এবং পেশিসঞ্চালনের মাধ্যমেও তাকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং সেই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক কর্মের সঙ্গে মানবিক ভাষার 'নাড়ির যোগ' বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

(খ) যাইহোক, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভাষার "সমাজমুক্তি"র ওপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করছি: কারণ, ধারাবাহিকভাবে উৎপাদনী শ্রমের মাধ্যমে মানব সমাজের ক্রমবিকাশ না ঘটলে—ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয় অভিব্যক্তির কোনো সম্ভাবনাই থাকত না। উপরন্তু, সমাজবিকাশ ব্যতিরেকে ভাষা এবং যুক্তির পরস্পর সম্পৃক্ত সুদীর্ঘ বিকাশও সম্ভব হত না। সুতরাং আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে—সামগ্রিক এবং মৌলিকভাবে ভাষা হল একটি জৈব-সামাজিক-ঐতিহাসিক ব্যাপার।[১৯] দেকথা আরো স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্যে, আমরা এবার সামাজিক ঐতিহাসিক ভাষামনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছি।

৩.

১. প্রাণী জাগতিক ধ্বনি

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী যে সমস্ত আওয়াজ করতে পারে, সেগুলো সবই হল—আবেগসূচক ধ্বনি[২০]। যেমন, মেরুদণ্ডহীন নিম্নস্তরী প্রাণীরা—ভয় পেলে এক ধরণের আওয়াজ করে; খাবার পেয়ে 'ফূর্তি' হলে করে আরেক রকম; আবার যৌনসঙ্গীর সান্নিধ্যে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের আওয়াজ বের করে। এরকম সব ধ্বনি মানুষের পূর্বপুরুষদেরও ছিল। আমাদের সমস্ত ভাষায় আজও তার ছাপ রয়েছে: ব্যাকরণের পরিভাষায়, এদের আমরা বলি—অনন্বয়ী অব্যয়[২১] (উঃ, আঃ; হা, আহা, ওহো; হো, ইত্যাদি)। বাক্যের সঙ্গে এদের কোনো কাঠামোগত অন্বয় (বা সম্বন্ধ) থাকে না বলেই এরকম নামকরণ হয়েছে। এবং মূলত এগুলো সমগ্র মানবজাতির একেবারে আদিম, আবেগসূচক ধ্বনি বলেই—পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় ঐ ধরণের আওয়াজগুলো প্রায় একই রকম। কিন্তু অন্য সব রকমের একার্থবোধক শব্দ বা ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আওয়াজের পার্থক্য আছে। সুতরাং এইসব (প্রকৃত) শব্দ কি করে তৈরি হল সেটাই আসল প্রশ্ন।

---

১৯. এই বিষয়টি উপলব্ধি না করায়, বা করতে না চাওয়ায়, ফলেই আধুনিক যুগে—ভাষার 'কালানুক্রমিক' বা diachronic দিকটি বাদ দিয়ে, শুধু 'সমকালিক' বা synchronic দিকটি নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে।

২০. emotive sound ২১. interjection

২· প্রাকৃত সাধারণিক অর্থযুক্ত ধ্বনি = সার্থক শব্দ

পূর্ববর্তী বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই বলছি: শব্দের অর্থ আকাশ থেকে পড়ে নি। মানুষেরাই দলবদ্ধভাবে শব্দের অর্থ বানিয়ে নিয়েছে। বাস্তব জগতে—বাঁচার তাগিদে যেমন হাতিয়ার বানাতে হয়েছে, তেমনি শব্দও বানাতে হয়েছে। আসলে শব্দগুলো এবং তাদের সম্মেলনে গড়ে-ওঠা শব্দবন্ধ এবং বাক্যগুলোও এক ধরণের হাতিয়ার। তবে এই হাতিয়ার উৎপন্ন হবার জমি তৈরি করে দিয়েছে—লক্ষ বছরের 'সামাজিক শ্রমে'র মধ্যে দিয়ে গড়ে-ওঠা উন্নত বাকযন্ত্র আর শুদ্ধমতিষ্ক, এবং তাদের স্নায়বিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বিকশিত দ্বিতীয় সংকেততন্ত্র। এগুলো ধরে নিয়েই আমরা মোটামুটিভাবে ধারাবাহিক একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করছি:

(ক) একসঙ্গে কাজ করতে হলে, বিভিন্ন কাজের সংকেত হিসেবে বিভিন্ন আওয়াজকে সবাই মিলে গড়ে-পিটে 'মেনে নেবার' অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে। এগুলো কিন্তু সবই সংকেতের সংকেত। যেমন—ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটা হরিণের পাল দেখে সবাই মিলে "হৈ হৈ" করে ছুটে যাবার ব্যাপারটা যাবার মেলার সংকেত। সেখানে প্রথমদিকে হয়তো বড়োরা ছোটদের ডাক দিয়েছে নামধরে অথবা ডাকি করে। সেটাই ছিল প্রাথমিকভাবে সংকেতের সংকেত। কিন্তু—"চল-চল / চলা-চলা" বলে হাঁক দিয়ে উঠলে কতো সহজে সবাই একত্র হয়ে লড়তে পারে। এইরকম ধরনের ক্ষেত্রে—চল্, যাব্, দিব—জাতীয় ক্রিয়াবাচকধ্বনি 'যাওয়ার সংকেত' ধরণ কাজকর্মের সংকেত (অর্থাৎ, ধ্বনিমূলক দ্বিতীয় পর্যায়ের সংকেত) হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তী বিকাশে এইরকম ধ্বনিগুলোই ক্রিয়াপদের মূল (অর্থাৎ 'ধাতু') হিসেবে গৃহীত হয়েছে। [সমস্ত প্রাচীন ভাষার অজস্র শব্দের মূল বা 'প্রকৃতি' (root)-গুলো বিচার করলেই একথা প্রমাণিত হবে।]

(খ) সবাই মিলে—শিকার, আত্মরক্ষা প্রভৃতি কাজ করতে গিয়ে প্রথমত বিভিন্ন প্রাণী এবং প্রাকৃতিক শক্তির বলে নানারকম ধ্বনি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। 'হাড়াই বাহাই' করতে করতে সম্মিলিত অভ্যাসের মাধ্যমে ঐ সব ধ্বনি পরিণত হয়েছে নাম-জাতীয় শব্দে: প্রথমে অনেকটাই যেন বিশিষ্ট নাম[২২] এবং অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে জাতিবাচক নাম[২৩] উৎপাদিত হয়েছে। এইভাবেই হাতিয়ার বানানোর কলাকৌশলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনেও কিছু কিছু আওয়াজকে নির্দিষ্ট কাজ বা বিশেষ ধরণের জিনিসের নাম হিসেবে ব্যবহার করতেই হয়েছে।...

প্রথম দিকে, উদ্ভিদিত বিবিধ শব্দ সম্ভারের, অর্থাৎ বিশেষ অর্থবিশিষ্ট ধ্বনিগুলোর কিছু এসেছে—মানব প্রজাতির মৌলিক প্রাণিগত আবেগসূচক আওয়াজ থেকে।[২৪] আবার কিছু কিছু এসেছে—অন্যান্য প্রাণীর ডাক[২৫] এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক আওয়াজের[২৬] অনুকরণ থেকে।· আবেগমূলক

---

২২. Proper noun ২৩. Common noun ২৪. হু-হু (হুই) > হুম্ জুম্ > ওউম্ > ওম্ ২৫. হাম্বা > হাম্-বা > আম্বা > আবা / গরু ২৬. ঝর্-ঝর্, ঝির্ ঝির্, গমগম্ > গগ্‌গন্।

প্রভাবের চরিত্র হিসেবে প্রায়শই এদের ভিন্ন প্রয়োগ ঘটেছে। (সমস্ত ভাষাতেই এসব বিকাশের নজির আছে বলেই দাবী করছি।)

এই ধরণের নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত ধীরে ধীরেই গড়ে উঠল (সঙ্কীর্ণ অর্থে) প্রকৃত ভাষার মৌলিক উপাদান : ধ্বনি পরিণত হল শব্দে। 'সবাই মিলেমিশে কাজ' অর্থাৎ সামাজিক শ্রম থেকেই যেহেতু শব্দ তৈরি হল, সেহেতু—হে, হো, হোই, হাই প্রভৃতি কিছু আহ্বানসূচক ধ্বনি (অর্থাৎ অনন্বয়ী অব্যয়) বাদ দিলে—একেবারে প্রথম দিকের শব্দগুলো প্রায় সবই ছিল ক্রিয়াবাচক শব্দ। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা পরপর এসেছে বিশেষ জাতীয় শব্দ অর্থাৎ নামপদ (বিশেষ্য, 'বিশেষণ', সর্বনাম)। বস্তুত, এরাই হল প্রাথমিকভাবে মৌলিক শব্দ। প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য শব্দ এবং বিভক্তি উৎপাদিত হয়েছে।

৩. শব্দ→শব্দবন্ধ→বাক্য

এই রকম বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার থেকেই বাক্যের উদ্ভব ঘটেছে। বস্তুত, সামাজিক শ্রমের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংগঠনের জটিলতাও বেড়েছে। তারই পর্যায়ক্রমে এসেছে—চেতনাবৃদ্ধি। যৌথ কর্ম এবং সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ক্রমবর্ধিত সমন্বয়ের জমাট-বাঁধা রূপ হিসেবেই "ব্যাকরণের যুক্তি" এবং "যুক্তির ব্যাকরণ" হাত ধরাধরি করেই এগিয়ে গিয়েছে। আপাতত সংক্ষেপেই বলছি :

(ক) প্রথম দিকে—শুধু একটা আবেগমূলক / আহ্বানসূচক ধ্বনির সঙ্গে একটা ক্রিয়াবাচক শব্দ জুড়ে দিয়ে শব্দবন্ধের মতো ব্যাপার তৈরি হত। যেমন—চল্-হো (> চলো ?)। প্রাচীন এবং অনেক আধুনিক) ভাষার ধাতুরূপে এর প্রমাণ টিঁকে আছে (সংস্কৃত 'অস্তি' ; গ্রীক—এস্তি : সে / তা আছে)। এসব ক্ষেত্রে—'কর্তা' উল্লেখ না করে শুধু ধাতু-বিভক্তি সংযোগে উৎপন্ন ক্রিয়াপদটি দিয়েই বাক্য বোঝানো যায়। বিশেষত, অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়ার রূপগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই (মূল) ধাতুর অনুরূপ ; (অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে 'সংস্কৃত' করা হয়েছে)।

(খ) পরবর্তী সামাজিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষদের অভিজ্ঞতা এবং কর্মের গতী হয়েছে বিস্তৃততর। ফলে পরিবেশ চেতনাও বেড়েছে। তারই ভেতর দিয়ে—প্রথমে দ্বিপদযুক্ত (কর্তা+ক্রিয়া), এবং আরো পরে ত্রিপদযুক্ত (কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া) বাক্য গঠিত হতে শুরু করেছে। —

ব্যাকরণের যুক্তিতে—বিভিন্ন প্রকার শব্দ এবং নানা রকমের বাক্য যেমন সমস্ত ভাষায় পাওয়া যায় ; তেমনি যুক্তির ব্যাকরণেও সরল / যৌগ বাক্যের "উদ্দেশ্য-বিধেয়" যুক্ত কাঠামো সব ভাষাতেই আছে। তেমনি রয়েছে অন্যান্য জটিলতর সংগঠন। মোটামুটিভাবে সাধারণ সামাজিক বিকাশ থেকেই "বিশ্বজনীন ব্যাকরণ"-এর এসব মৌলিক বিষয় গড়ে উঠেছে। তার ব্যাখ্যা এখন প্রযোজ্য।

একবিংশ শতাব্দী না ষষ্ঠ শতাব্দী?

ক্ষমা মুখোপাধ্যায়

দশম জন্মদিন উৎসব শেষ করে 'মানবমন' আবার নতুন বছর শুরু করলো। ১৯৮৫ সালের অক্টোবর সংখ্যায় মানবমনের যে নিদান ঘোষণা করা হয়েছিল দেখা যাচ্ছে আধুনিক চিকিৎসায় আপাততঃ তার নিরসন হয়েছে। 'মানবমন' দীর্ঘজীবী হোক এই কামনা করি।

নারী ও শিশুবিভাগের জন্য কিছু লিখতে গিয়ে সবার আগে যে বিষয়টি মনে আসছে তা নিয়ে ইদানীং প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকাতেই এবং প্রায় প্রত্যহই কিছু না কিছু লেখা হয়েছে, তা সে খবরই হোক, বা প্রবন্ধই হোক, বা চিঠিপত্রই হোক। সেটি হল তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলা শ্রীমতী শাহবানুর ভরণপোষণের দাবীতে সুপ্রীম কোর্টের রায়, শিক্ষিত উদারচেতা মুসলমান ও অন্যধর্মাবলম্বীদের তাকে সমর্থন, এবং তার বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ও আন্দোলন। এবং সর্বোপরি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর প্রথমে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে সমর্থন জানিয়ে পরে সনাতনপন্থীদের চাপে এবং দলগত-স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নূতন আইন প্রণয়ন করে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে নাকচ করার প্রচেষ্টা।

'মানবমন' রাজনীতি চর্চার জায়গা নয়। কিন্তু সামাজিক নিয়মকানুন যেখানে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিক এবং রাষ্ট্রীয় আইন যেখানে দলগত স্বার্থরক্ষার কলকাঠি। সেখানে সামাজিক সমস্যার আলোচনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা আবশ্যিকভাবেই এসে পড়ে। তবু এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে রাজনীতির আলোচনা থেকে আমি বিরত থাকছি।

শ্রীমতী শাহবানুর কেস সম্বন্ধে 'মানবমনে'র পাঠকরা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। পাঁচটি সন্তানের জননী শাহবানু বেয়াল্লিশ বছর স্বামীর ঘর করার পর স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত হলেন, কারণ স্বামী তখন নবপত্নী গ্রহণ করেছেন। আপন ভরণপোষণে অসমর্থ শাহবানু স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণের দাবীতে স্থানীয় ভারতের আদালতের আশ্রয় নিলেন। সুপ্রীম কোর্ট শাহবানুর পক্ষে রায় দিলেন এবং বললেন ভারতীয় ফৌজদারী আইনবিধির ১২৫ ধারা অনুযায়ী শাহবানুর স্বামীকে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট এ কথাও বললেন এই ১২৫ ধারার সঙ্গে যদি মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের (শরিয়তের) বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ১২৫ ধারাই বলবৎ হবে। শাহবানুর কেস সম্বন্ধে সংক্ষেপে এটুকু বললাম শুধু স্মৃতিটা একটু ঝালিয়ে নেবার জন্য। এ নিয়ে আর আলোচনা করবো না। কিন্তু এই সূত্রে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, শুধু সেটিই নিবেদন করবো।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের স্বপক্ষে একদিকে যেমন শিক্ষিত উদারপন্থী হিন্দু-মুসলমান নারী ও পুরুষ মত ব্যক্ত করেছেন, অন্যপক্ষে তেমনি বহু সনাতনপন্থী হিন্দু-মুসলমান বিরুদ্ধ মতামতে সোচ্চার হয়েছেন। তারপর

রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পার্টি দলগত স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য যে সংশোধনী বিল এনেছেন তার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত আমরা শুনেছি। শাহবানুর কেসে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ইসলাম বিপন্ন বলে যাঁরা চিৎকার তুলেছেন তাঁদের একমাত্র দোহাই হল কোরাণে কী আছে আর কী নেই। মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় কোনো কিছুরই কোনো অর্থ তাঁদের কাছে নেই। কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি দেখে যাঁরা সুপ্রীম কোর্টের রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন, যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সদ্ভাবপরায়ণের নিন্দা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই নিজের মতের সমর্থনে কোরাণেরই আশ্রয় নিয়েছেন, তার প্রতিপাদ্য বিষয়ে নূতন অর্থ যোজনা করেছেন। এমনকি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক শ্রীকৃষ্ণ আয়ার, যিনি এ বিষয়ে রাজীব গান্ধীকে পত্র দিয়েছেন, যিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন যে যদি এই বিল পাশ হয় তাহলে সুপ্রীম কোর্টে এর বিরুদ্ধে মামলা আনবেন, তিনি বলেছেন "The Bill is an injustice to our secular principle, it is an injustice to women's basic rights and, therefore, violation of human rights.—It is a vindicative injustice to Muslim Women selling the soul of the states humanism to obscurantist fundamentalist," তিনিই আবার বলেছেন, 'it is an injustice to holy Quran which insists on payment of maintenance of divorced women in distress' কোরাণে, এবং হাদীসশরীফে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের 'ইদ্দত' সময়টাতেই স্বামীদের খোরপোষ দেবার নির্দেশ দেওয়া আছে, তার পরের কথা উল্লেখ নেই। —নেবে না, একথাও বলা হয় নি। শুধু কর্তব্যভার আছে ,তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের জন্য সংস্থান ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু এ উপদেশ শুধু প্রাক্তন স্বামীদের প্রতি নয়, সামাজিক মানুষের প্রতি। যাই হোক, আমার বক্তব্য হল মানবিকতা ও সামাজিক কল্যাণবোধের মধ্যে যে কাজের সমর্থন রয়েছে তার সমর্থনের জন্য কোরাণের দোহাই দিতে হবে কেন? বর্তমান যুগের শিক্ষিত উদারদৃষ্টি মুসলমানরা কেন বিদ্রোহ করে বলতে পারছেন না 'কোরাণের সব কিছুই আমরা মানব না'? দেড় হাজার বছর পূর্বে যে সামাজিক আইন তৈরী হয়েছে বর্তমান পৃথিবীতে সে আইন অচল, এ কথা বলার সাহস নেই কেন?

দু হাজার বছর ধরে মনুর আইনে হিন্দুসমাজ চলেছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। এই বিধবা বিবাহ আইন সম্বন্ধে সেই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল, এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বহু কটূক্তি, বিদ্রূপ, বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি সেই সময়ে হিন্দুশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়, শাস্ত্রে এর বিধান আছে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে যখন ভারতীয় সংবিধানে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়, এবং ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন ও হিন্দু কোড বিল পাশ হয়, তখন তার প্রণেতাদের তাদের কাজের সমর্থনের জন্য শাস্ত্রের আশ্রয় নিতে হয় নি, উদার মানবিকতার ও আধুনিক মূল্যবোধের সাহায্যে এসব নতুন আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। হিন্দুরা যদি এতদিনের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পেরে থাকে তাহলে মুসলমানরা কেন পারছে না? কেন তারা বলতে পারছে না দেড় হাজার বছরের পুরোনো সমাজে গৃহীত আইন আজ আর আমরা মানবো না? কোরাণে অবাধ্য স্ত্রীলোককে প্রহার করবার নির্দেশ আছে। আরো আছে, "যদি কোনো স্ত্রীলোক ব্যভিচারী হয় তাহলে তাকে আমৃত্যু ঘরে বন্ধ

করে যারা আজ সমাজসম্মত মুসলমানরা যদি সংবিধানের ২৫ ধারার অনুসরণে ধর্মরক্ষার নামে দাবী করে কোরাণবর্হিত অবাধ্য বা ব্যভিচারী নারীদের এই শাস্তি দেবার অধিকার তাঁদের আছে তাহলে উদারপন্থী মুসলমানরা কিসের দোহাই দিয়ে তাদের বিরোধিতা করবে বা রাজীব গান্ধীর সরকার কি আবার নতুন আইন তৈরী করে এই প্রহার এবং হত্যা আইনসঙ্গত করবে ?

উদারপন্থী মুসলমানদের দরবারে আমার এই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে গিয়ে এমন কয়েকজন মুসলমানের কথা আমার মনে আসছে যাঁরা মুক্তমনে সাহসের সঙ্গে কোরাণ বিধিই সামাজিক বিধিনিষেধের নিন্দা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীহোসেনুর রহমান। তাঁর বক্তব্য থেকে একটু উদ্ধৃত করছি—

"মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বা শরিয়ত আজ ততখানি রক্ষা পাবে যতখানি বর্তমানের জন্য যথার্থ প্রয়োজন, আর এ কথা বললে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়বে না। কারণ, আমার অনেক আগে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ইসলামবিদ আলফ এ এ ফাইজী স্পষ্ট করে বলে গেছেন ইসলামের পুনর্বিচার চাই। আজকের মানুষ আজকের চিন্তা ও বীক্ষিবোধ নিয়ে ইসলামকে বিচার করবে।... ...তার একটা নিজস্ব প্রগতির চিন্তা ও দৃষ্টিবোধ আছে। আবার তার কতগুলো শাশ্বত মঙ্গল ও নীতিবোধ আছে। যেমন আছে আর পাঁচজন অমুসলমানের। এই আধুনিক পৃথিবীতে সেই শাশ্বত মূল্যবোধ আমার আপনার সবার ধর্মচিন্তার চেয়ে মূল্যবান।"

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের মহিলা নেত্রী শ্রীমতী সুফিয়া কামাল শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। এক অনুষ্ঠানে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর কন্যা শ্রীমতী সুলতানা কামাল বৃত্তিতে আইনজীবী, কর্মস্থান সিলেট। মেয়েদের আইনগত সাহায্য ও উপদেশ দেওয়া তার জীবিকার বিশেষ ক্ষেত্র। বিয়ে করেছেন চক্রবর্তী ব্রাহ্মণকে, তিনিও আইনজীবী। আলোচনা প্রসঙ্গে সুলতানা বললেন, "কোরাণ অনুসারে মেয়েরা পুরুষের সম্পত্তি, পুরুষ নারীর প্রভু। কোরাণে শুধু তাদের একটু দয়ালু প্রভু হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

দেশের সমস্ত বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ আজ তাকিয়ে আছে শাহবানু কেসের বিপত্তির দিকে। তারা বুঝতে চাইছে আমরা কি বিংশশতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে যাব, নাকি রাজীব গান্ধী সরকারের নেতৃত্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিরে যাব, যে সময়ে এই কোরাণ বাহক অযোধ্য বস্তুটির রূপায়ন হয়েছিল ?

ধর্মনিরপেক্ষতা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় পরিণত হয় তখন কোন অস্ত্রে তাকে খণ্ডন করা যায় ? অসহায়ভাবে বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি পংক্তি বার বার মনে পড়ছে, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

ডাইনোসর বিষয়ে

ডাইনোসরদের শুরু কোন সময়ে তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। তার হদিশ পাওয়ার সূত্র ভূতাত্ত্বিক অতীতের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ডাইনোসররা আমাদের গ্রহে ১৭ কোটি বছর ধরে আধিপত্য করেছিল। সেটা ছিল মধ্যজীবীয় যুগের ট্রায়াসিক, জুরাসিক ও ক্রিটেশাস সময়কাল যতোদূর ধারণা করা যায়, ডাইনোসররা পৃথিবীতে এসেছিল ২০ থেকে ২৪ কোটি বছর আগে। আর পৃথিবীতে থেকে লোপ পেয়েছে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে, ক্রিটেশাস সময়কালের শেষদিকে—যা, আজ থেকে প্রায় ৭ কোটি বছর আগে।

সকলেই জানেন, প্রাচীনতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যতো জীব বাস করে গিয়েছে তাদের মোট সংখ্যার কাছে আজকের পৃথিবীতে যতো জীব বাস করছে তাদের সংখ্যা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। এই পৃথিবীতে যতো প্রজাতির জীব উদ্ভূত হয়েছে তাদের ৯৯ শতাংশই লুপ্ত। এভাবে লোপ পাওয়ার কারণ কী? প্রশ্নটা আরও বিশেষভাবে তোলা চলে—পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিবৃত্তে ডাইনোসরদের জীবনকাল এমন অকস্মাৎ ও এমন সম্পূর্ণরূপে শেষ হতে গেল কী করে?

বিশেষজ্ঞদের অভাব যেমন বিভিন্ন, তেমনি পরস্পর-বিরোধী। কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন সরীসৃপরা যে এভাবে লোপ পেয়েছিল তার কারণ, পর্বত-গঠন ও আগ্নেয়গিরির তৎপরতার ফলে গ্রহের ভূত্বকের পুনর্বিন্যাস। অন্যদের মতে, বড়ো রকমের জলবায়ুগত পরিবর্তন ও মহাজাগতিক বিকিরণ। আরো একদলের মতে, উল্কাপাত। এছাড়াও একদল আছেন যাঁরা বিবেচনা করেছেন অ-জৈব ও জৈব হেতু। অ-জৈব হেতু বলতে তাঁরা উল্লেখ করেছেন ভূ-গোলকের রূপান্তর ও তার বিপর্যয়কর আঘাত। জৈব হেতু বলতে প্রজাতির অনিবার্য বয়ঃপ্রাপ্তি ও অবলুপ্তি এবং অধিকতর সমর্থ প্রজাতির উদ্ভব। জৈব হেতুর সমর্থক-দলে আছেন বর্তমান বিশ্বের কয়েকজন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী। তাঁরা ডাইনোসরদের অবলুপ্তির কারণ হিসেবে জৈব হেতুকেই জোরালোভাবে উপস্থিত করেছেন। তাঁদের মতের সমর্থনে তাঁরা উপস্থিত করেছেন ডারউইনের বিবর্তন-বাদের তত্ত্ব।

মধ্যজীবীয় যুগে সরীসৃপদের অবস্থিতি ছিল যেমন বিশাল ও তেমনি ব্যাপ্তি। মধ্যজীবীয় যুগটিকেই বলা হয় সরীসৃপদের যুগ। ডাইনোসররাও সরীসৃপ এবং তারাই এই মধ্যজীবীয় যুগে আধিপত্য করত। অথচ, ভূতাত্ত্বিক বিচারে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এটা কেমন করে হতে পারল, কী অবস্থায়, তা বিচার করার একটা সূত্র পাওয়া যায় ডারউইনের তত্ত্ব থেকে।

ডারউইন বলেছেন, পুরনো প্রজাতির জীব মরে যাওয়া এবং নতুন ও উন্নত প্রজাতির জীবের উদ্ভব হওয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ পারম্পরিক সম্পর্ক আছে। প্রজাতিরা ও প্রজাতির গোষ্ঠীরা ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যায়। প্রজাতির মধ্যে যদি উন্নত বংশলক্ষণ নিয়ে সন্তানের জন্ম হয় তাহলে সেই বংশলক্ষণ টিকে যায় ও পুরনো

বংশলক্ষণ যারা পড়ে। এমনিভাবে একই পরিবারের ধারা বহুবার গণ পুরনো গণের স্থান নিতে পারে। এক শ্রেণীর প্রজাতি যদি উদ্ভূত হয় তাহলে অন্য শ্রেণী ধ্বংস হয়ে যায়। তবে পুরোপুরি বিলুপ্ত হতে খানিকটা সময় লাগে। কেননা পুরনো শ্রেণীর কারও কারও পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও টিকে থাকা অসম্ভব নয়। তবে অবলুপ্তি দ্রুত ও সর্বাত্মক হয় যদি বৈর কারণের সঙ্গে যুক্ত হয় ভৌত ও ভৌগোলিক কারণ (যেমন, ভূমিকম্প)।

যাই হোক, বিজ্ঞানীরা এখনো জানতে চেষ্টা করছেন ডাইনোসরদের অবলুপ্তির কারণ কী—জলবায়ুর আকস্মিক পরিবর্তন? খাদ্যাভাব? প্রজাতিতে প্রজাতিতে সম্পর্কের অবনতি? টিকে থাকার সংগ্রামে পরাজয়? মহাকাশের কোনো বিপর্যয়কর ঘটনা?

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭ কোটি বছর আগে

সময়টা ছিল এমনই যে গোটা পৃথিবীকে মনে হতে পারত প্রকৃতই আধা-উষ্ণমণ্ডলীয় বর্ষরাজ্য। জলবায়ু ছিল বৃহৎ, উষ্ণ ও অবিচল। পৃথিবীর বিরাট এলাকা জলে ঢাকা ছিল। গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে যেত। জলনিকট জমির ওপরে কার্পেটের মতো ছেয়ে থাকত ঘাস ও হর্সটেল। জলাভূমির ওপর ছাতার মতো মেলে থাকতো বিশাল বিশাল সাইপ্রেস গাছ। অপেক্ষাকৃত শুকনো জমিতে জন্মাত সাগো গাছ, চেহারায় অনেকটা তালগাছের মতো। সাত-মিটার পর্যন্ত লম্বা হত তাদের চকচকে সবুজ পাতা। বিশাল পাখার মতো পাতাগুলো সিকগো গাছের সারি দেখা যেত সমুদ্র ও নদীর তীরে। আর এই সময়েই প্রথম দেখা দিয়েছিল সপুষ্পক গাছ। বাতাসে পাওয়া যেত ফুলের মদির সৌরভ।

এই ছিল তখনকার অতি-বর্ষিষ্ণু পরিবেশ। চারদিক তরিয়ে তুলে ঘাস করত গজাকড়িং, কচ্ছপ, সিরসিটি, আর জগতের প্রভু ডাইনোসররা। সরীসৃপ যুগের বৃহত্তম সরীসৃপ ছিল এই ডাইনোসর। পৃথিবীর সকল মহাদেশে তাদের আধিপত্য ছিল।

আকারে বৃহৎ, সারা গা আঁশে ঢাকা, এই আতঙ্কজনক জানবরা মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত ২৫ মিটার লম্বা হতে পারত। তাদের কারও কারও মাথায় থাকত শিঙ, গায়ে বর্মের মতো ফলক, বর্মের মতো শিরস্ত্রাণ। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে প্রাচীন তারা থাকত ডাঙায় আর মাংসাশী ছিল। তৃণভোজীরা পরে এসেছিল। তাদের কেউ কেউ জলের জীবনে ফিরে গিয়েছিল।

এইসব সরীসৃপের কারও কারও ঠোঁট ছিল হাঁসের মতো, পা ছিল পাখির মতো। অতএব উটপাখির মতো দৌড়তে পারত। আরও একদল ছিল যাদের চলন এতই ধীরে যে মনে হত চলৎশক্তিহীন।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও ডাইনোসরদের সম্পর্কে কোনো খবরই মানুষের জানা ছিল না। জীব হিসেবে ডাইনোসর ছিল মানুষের কাছে অস্তিত্বহীন। কিন্তু পুরাজীববিদ্যার আবিষ্কার ক্রমে ক্রমে মানুষের কাছে এই জীবদের নানা নিদর্শন উপস্থিত করল। তখন মনে হতে লাগল অতিকথার জানবরাই যেন সত্যি নেমে এসেছে।

ব্রন্টোসরাস, ডিপ্লোডাকাস ও ব্রাকিওসরাস লম্বায় হত ৩৫ মিটার (একটি বড়ো তিমির মতো আকার), উচ্চতায় ৯ মিটার (দেহের সর্বোচ্চ অংশ থেকে মাটি পর্যন্ত) আর ওজনে ৩০ টন। বিশাল এই তৃণভোজীরা

বাস করত সমুদ্রের উপকূলের কাছে ও বড়ো বড়ো ঝুঁকে।

মাংসাশীদের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল কার্নোসরাসরের। বিশাল এই সরীসৃপদের সামনের পা-দুটি হত খুবই ছোট, চোয়াল খুবই শক্তিশালী, দাঁত ধারালো ও বাঁকানো। অতি বিপজ্জনক এই মাংসাশীরা তাদের তৃণভোজী স্বজাতীয়দের অনায়াসেই গ্রাস করত। এই দলের মধ্যে সবচেয়ে আতঙ্কজনক ছিল টাইরানোসরাসরা। লম্বায় ১৭ মিটার, উচ্চতায় ৯ মিটার ও ওজনে ১০ টন এই সরীসৃপের মতো এমন প্রচণ্ড মাংসভুক প্রাণী জীবজগতে আর কখনো দেখা যায়নি।

তৃণভোজী ডাইনোসরদের মধ্যে একটি পরিচিত নাম—ইগুয়ানোডাইন্ট। জীববিজ্ঞানীরা এই ডাইনোসরটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। প্যাডেলযুক্ত দুই-পা-অলা এই জীবটি থাকত মিঠাজলের এলাকায়, খেত কার্ন গাছের পাতা ও অঙ্কুর।

ডাইনোসরদের অপর একটি গোষ্ঠিকে বলা হয় হাইড্রোসরাস। এই সরীসৃপের ঠোঁট হাঁসের ঠোঁটের মতো, পর্দা-আঁটা পা সাঁতার কাটার উপযোগী, মাথাটা চ্যাপটা ধরণের খোরালো লেজ, মাথার উঁচুতে নাকের ফুটো। তাছাড়া করোটিতে এমন কিছু লক্ষণ আছে যা থেকে বোঝা যায় জীবটি জলচর।

তৃণভোজী ডাইনোসর আছে আরো অনেক প্রকারের—যেমন, স্টেগোসর, ট্রাইসেরাটপস ইত্যাদি। কিন্তু কিছুত ও অপরিণত এই জীবরা সহজেই আক্রমণকারীর শিকার হত এবং মধ্যজীবীয় যুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে।

ডারউইন বলেছিলেন, জীবদের থাকার জায়গা ক্রমেই সংকুচিত হয় এবং অবশেষে তারা অবলুপ্ত হয়। ডাইনোসরদের বেলাতেও তাই ঘটেছে। সমৃদ্ধির সময়ে ডাইনোসররা ছড়িয়ে ছিল শুধু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় নয়, উপরন্তু এশিয়াতেও। কিন্তু ক্রিটেশাস সময়কালের শেষে তাদের থাকার জায়গা সংকুচিত হয়ে সীমাবদ্ধ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি মাত্র এলাকায়। এই সময়ে তাদের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল। এটাও একটা গুরুত্ব কারণ যে এই সময়ের মধ্যেই স্তন্যপায়ীরা আবির্ভূত হয়েছিল।

ডাইনোসরদের চিহ্ন

বিশাল এই প্রাণীদের ফসিল অনুসন্ধানের কাজ গত কয়েক দশকে বেশ ভালোভাবেই হয়েছে ১৯১০ সাল থেকে শুরু করে পুরাজীববিদরা আরও পঞ্চাশটিরও অধিক ডাইনোসরের প্রজাতি তাঁদের শ্রেণীবদ্ধ তালিকায় যুক্ত করতে পেরেছেন। এখন ডাইনোসরদের হাড় পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন নদী-তলির তীরে পলিমাটিতে, জলাভূমিতে ও হ্রদে, বালিপাথরে ও চুনাপাথরে এবং সকল মহাদেশের মৃত্তিকায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে—প্রকৃতই একটি কবরস্থান বলা চলে—মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সরীসৃপের ফসিল প্রধানত পাওয়া গিয়েছে মধ্য-এশিয়ার তিনটি প্রজাতন্ত্রে—কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান ও কিরগিজিয়ায়। উপরন্তু পাওয়া গিয়েছে মধ্যজীবীয় যুগের ডাইনোসরদের

অভাবনীয় কয়েকটি নিদর্শন—তাদের পায়ের ছাপ।

মৃত প্রাণীদের হাড় তো প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু শিলার ওপরে মৃত প্রাণীদের পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা বড়ো একটা ঘটে না। এমনি একটি বিরল ঘটনাই সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্প্রতি ঘটেছে। তুর্কমেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে ডাইনোসরের পায়ের ছাপ।

পুরাজীববিদরা মনে করেন, ফসিল হিসেবে পায়ের ছাপ পাওয়াটা একটি বিরলতম ঘটনা। এমনি ছাপ থেকে শুধু যে একটি প্রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে তাই নয়, আরও জানা যাচ্ছে অতীতের জৈব জগৎ সম্পর্কে প্রচুর খবর।

ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে খোজা-পিল আতা নামে একটি গ্রামের কাছে ছোট মালভূমির ওপরে। তুর্কমেনীয় ভাষায় গ্রামের নামের অর্থ "পিতামহের পবিত্র হাতির পায়ের ছাপ" এই নাম তৈরি হওয়ার পিছনে একটি লোক-কাহিনী ছিল। শিলাময় মালভূমিতে বড়ো বড়ো পায়ের ছাপ লোকের নজরে পড়ত। অন্যদিকে তারা জানত, দু-হাজার বছর আগে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সৈন্যবাহিনী এই অঞ্চল দিয়ে গিয়েছিল। তখন তারা গল্প বানিয়েছিল যে পায়ের ছাপগুলো আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সৈন্যবাহিনীর হাতিদের।

এই গল্প শোনার পরেই ১৯৮০ সালে প্রথম একজন ঐতিহাসিক ও একজন ভূতত্ত্ববিদ এই অঞ্চলে আসেন। তাঁরা সত্যিই দেখতে পান চুনাপাথরের ওপরে অজস্র অদ্ভুত চেহারার পায়ের ছাপ।

তারপরে স্থানটি পরিদর্শন করতে আসেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির পুরাজীববিদ্যা ইনস্টিটিউট। তাঁরা একবাক্যে মত দেন, পায়ের ছাপগুলো ডাইনোসরের। তারপরে তিনবছরে এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় ৪০০ ডাইনোসরের পায়ের ছাপ। ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে এই অঞ্চলে আরো দুটি বৈজ্ঞানিক অভিযান চলে এবং আরো পায়ের ছাপ আবিষ্কৃত হয়।

বর্তমানে আবিষ্কৃত পায়ের ছাপের সংখ্যা ২৫০০। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই ছাপগুলো আপার জুরাসিক সময় কালের। আবিষ্কারটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে আপার জুরাসিক সময়কালের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ এযাবৎ পর্যন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি।

ডাইনোসরের পায়ের ছাপ অনুসন্ধান এবং তা নিয়ে গবেষণা সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অব্যাহত রেখেছেন।

ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৮৮ কলিকাতায় সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।

মনোবিদের জন্মনা

মনোবিদ

মনোবিদ্যা ক্রমশ প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমান মর্যাদার অধিকারী হতে চলেছে। কিছুদিন আগেও মনোবিদ্যা অধিবিদ্যার পাশাপাশি অবস্থান করতো। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইন্দ্রিয়, বিশেষ করে দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় নিয়ে ল্যাবরেটরিতে প্রকৃতিবিজ্ঞানানুগ পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়। সেই সব পরীক্ষা চলে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে। এই সব পরীক্ষালব্ধ ফল মনস্তত্ত্বকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি। আমেরিকার উইলিয়ম জেমসকে বর্তমান মনোবিদ্যার জনক বলা হয়। তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণায় পশ্চিম ইয়োরোপের ল্যাবরেটরিতে লব্ধ তথ্যের উল্লেখ থাকলেও, প্রভাব খুব কমই দেখা যায়। অন্তর্বীক্ষণ-এর সাহায্যে চিন্তাভাবনা ইত্যাদি মননক্রিয়ার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যার চেষ্টা চলে। জেমস প্রমুখের-এর গবেষণা ও কার্যকলাপের মর্যাদা হানি না করেই বলা চলে যে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের হদিশ পাবার জন্য এঁরা বিশেষ চেষ্টা করেন নি। তাঁরা ভাববাদী দর্শনের কাছে মনোবিদ্যার সূত্র, মননক্রিয়ার তত্ত্ব-অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের যেথডলজি প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো উপায় তাঁরা খুঁজে পাননি। তাই বিশের দশকের প্রথম দিকে ফ্রয়েড কল্পিত তিন স্তর ভিত্তিক নির্জ্ঞানতত্ত্বের ও পরবর্তীকালে এরই মানসিত রূপ ইদ-ইগো-সুপারইগোর আনুমানিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের মননক্রিয়া বোঝবার চেষ্টা চললো। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান উইলিয়ম জেমস-এর সমর্থনে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পাবার ফলে মেটাফিজিক্স-এর আওতা থেকে বেরিয়ে এসে মনোবিদ্যা স্বতন্ত্র 'ডিসিপ্লিন' হিসেবে পরিগণিত হল। মস্তিষ্ক-এর শারীরবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ-এর অনুসন্ধানের পথ কিন্তু এর মধ্যে পাওয়া গেছে পাভলভের 'ক্লাসিক' যেথড আবিষ্কারের ফলে। রুশ দেশের অন্য এক বিজ্ঞানী বেখটেরেভের আবিষ্কৃত কিছু তথ্য পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকার তাত্ত্বিকদের প্রভাবিত করেছিল। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের এই সব পরীক্ষাগারে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল আচরণবাদ (বিহেভিয়ারিজম্)। বেকটেরেভ-এর পরীক্ষানিরীক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। যান্ত্রিক জড়বাদী যানবধারণাপুষ্ট আচরণবাদ চিন্তাভাবনা ইত্যাদি সূক্ষ্ম মানসিক ক্রিয়া-কলাপকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তির আচরণের মধ্যেই তার মানসিক ক্রিয়াকলাপের পূর্ণ প্রতিফলন খুঁজলেন। মানসিকতাকেও বস্তুধর্মী বলে বিবেচনা করলেন। মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সূত্র দিয়ে মানসিকতার অভিব্যক্তির ব্যাখ্যার জটিলতার মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করলেন না। ফ্রয়েড-এর নির্জ্ঞানধর্মী সাইকোলজি ভাববাদী-দর্শনে প্রভাবিত অধিকাংশ পণ্ডিতের কাছে মনের গভীরে অনুপ্রবেশকর 'Depth Psychology' বলে বিবেচিত হল এবং প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল। পাভলভ শারীরবিদ্যায় অবদানের জন্য নোবেল প্রাইজ পেলেন, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক

[মানসিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার অংশের) বিজ্ঞানভিত্তিক সাইকলজি পশ্চিমী পণ্ডিতদের কাছে দুর্বোধ্য বলে অবহেলিত হল। আচরণবাদী সাইকলজিস্টদের এক ছোট গোষ্ঠী বলে পরিগণিত হলেন পাভলভবাদীরা ও পশ্চিমীদের লেখা পাঠ্যপুস্তকে। বর্তমানকে পুনরুজ্জীবিত করলেন স্কিনার মুক্তরাষ্ট্রে। তাঁদের প্রবর্তিত 'অপারেন্ট কন্ডিশনিং'-তত্ত্ব মনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার দাবী জানানোর ব্যবসাদ—দেহ-মন সমাস্তরালবাদ অক্ষত রইল। ভাববাদী ধর্মাশ্রিত মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বাস্তিক জড়বাদী আচরণবাদীদের সঙ্গে অনায়াসে আপোষ করে বাস্তিক বস্তুবাদী (কাজেই মার্কসবাদপন্থী) মনোবিজ্ঞানকে অপাংক্তেয় করে রাখবার প্রয়াস করলেন।

এ কথাগুলো মনোবিদের ডায়েরীর পাঠকদের কাছে নতুন নয়। তাঁরা ভুরু কুঁচকে এই পুনরাবৃত্তির কারণ জানার দাবি করতে পারেন। তাই আগে থেকেই কৈফিয়ৎ জানাচ্ছি।

আপনারা অনেকেই জানেন যে আজকালকার মনোবিদরা শুধু ব্যক্তিমানস নিয়ে চর্চা করেন না, গোষ্ঠীমানস, সমাজমানস নিয়েও তাঁদের চিন্তাভাবনা চর্চা ও অধ্যয়ন করতে হয়। এবং মানবমনের সম্পাদকীয় দপ্তরে মনোবিদের নামে নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর, অনেকরকম সমস্যার সমাধানের সূত্র জানাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি আসে। বেশিরভাগ প্রশ্ন ও সমস্যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শুধু পত্র-লেখককে উত্তর দিলেই মনোবিদের দায়িত্ব মিটে যায়। কিন্তু দু'একটি এমন প্রশ্ন থাকে যার সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর কোনো সমস্যার বা গোষ্ঠীগত কোনো স্বার্থের সম্পর্ক জড়িত। এক ভদ্রলোক বন্ধু এমনি একটি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশ্নকর্তা ছাড়া আরো বহু পাঠকের এই বিষয়ে আগ্রহ আছে, মনে হয়েছে। তাই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে পাঠকদের জানাতে চাই যে মনোবিদ্যা এখনও বেশির ভাগ মানুষের কাছে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মত বিষয় ও বিশ্লেষক বা নির্ভুল সমাধান সূত্রের সন্ধান দানে সক্ষম হয়ে ওঠেনি। মনোবিদদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন তত্ত্ব ভক্তী তাই তাঁদের বিশ্লেষণ বা সমাধান সূত্র ভিন্ন হবারই সম্ভাবনা।

বর্তমানে মনোবিদদের ভূমিকা বহুমুখী ও তাঁদের কর্মক্ষেত্রও বহু ধারায় বিভক্ত। মনো বিদ্যা বর্তমানে মুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহারিক বা আচরণবাদী বিজ্ঞান নামে পরিচিত। রাষ্ট্র পরিচালনায়, পণ্য-উৎপাদনে, পণ্য বিপণনে, পেশা নির্ধারণে, পরিকল্পনা প্রণয়নে ও রূপায়নে, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, প্রশাসনে, সন্তানপালনে ইত্যাদি বহুবিষয়ক ব্যাপারে মনোবিদদের ডাক পড়ে সুচিন্তিত পরামর্শ-দানের জন্য। আধুনিক মনোবিদরাও বহুবিষয়ের মত নানাবিধ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠানিক কার্যাদি সম্পন্ন করেন। অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে মনের গোপন গহ্বরে নিহিত অবদমিত কামনাবাসনার হদিস পাবার 'ফ্রেজ'-এ এখন তাঁরা পড়েছে। মনের রোগের চিকিৎসায় ঔষুধ ও তড়িৎ-চিকিৎসা (ই. সি. টি,) বিফল হলে মনোসমীক্ষার নির্দেশের পরিবর্তে মনোবিদরা এখন মনের বদলে আচরণ বদলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। দু-দশকের মধ্যে মনোবিদ্যার জগতে ও মনোবিদদের অনুসন্ধান, তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার, উপদেশ প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেন কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ মানুষের মন ও মনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ঔৎসুক্যের বাড়া বেড়েছে, মনের রোগ সম্পর্কে বাস্তব ও অনেকটা বিজ্ঞানানুগ চিন্তার প্রসার ঘটেছে। তাহলে, আসুন

আপাতাবিজ্ঞ, রোমাঞ্চ, দেবস্থানের মাহাত্ম্য কমেছে আমার কোন ধারণা নেই, কমেনি বরং বেড়েছে। বিশ্বিত মহলে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে ESP (এক্সট্রা সেনসুয়াল পারসেপশন) নিয়ে অনুসন্ধিৎসা ও আলোচনা বেড়েই চলেছে। র‍্যাকেট ও মিসিয়া নিয়ে মাতামাতি কমলেও প্যারাসাইকলজি বিজ্ঞানের মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে 'সকল দেশের সেরা' যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের দু'একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। 'হাইটেকের' বহু-প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সভ্য দুনিয়াকে 'হাইকোন্ট'-এর আধ্যাত্মিক আবেষ্টনের প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমার আসল বক্তব্য থেকে বোধহয়, একটু দূরে সরে এসেছি। মনে হয়, প্রয়োজন ছিল। বিজ্ঞানসাহিত্য, চলচ্চিত্র ইত্যাদি মানুষের মনোভাবকে প্রভাবিত করে, এ সম্পর্কে বর্তমানকালে জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে কোনো বিশেষ মতভেদ নেই। তবে কিভাবে প্রভাবিত করে ও এই প্রভাবের প্রকৃতি কি এ নিয়ে কিন্তু সকলে একমত নন। তাই এই গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা।

দেশভাগকে ভিত্তি করে তৈরী টেলিফিল্ম 'তমস' আজ প্রায় সব পত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে। আমার পরিচিত মহলের সকলেই কমবেশি উত্তেজিত। আমার সঙ্গে মঙ্গলবারের আড্ডাধারীদের মৃদু উত্তাপ সকারক আলোচনা হয়েছে। তাঁদের উৎসাহ উত্তেজনার শরিক হতে পারিনি বলে তাঁরা ক্ষুণ্ণ না হলেও ক্ষুব্ধ হয়েছে। আমার বার্ধক্যজনিত অনুভূতিহীনতা বলে দুঃখিতও হয়ে থাকতে পারেন। এমনি সময় দূরদর্শনের ছেলেটির চিঠি পড়ে জানলাম যে আমি একলা নই, অল্পবয়সীদের মধ্যেও আমার সমধর্মী দু'চারজন আছেন। এরপর মহানগরীর এক নামী বিজ্ঞানকেন্দ্রের একজন মধ্যবয়সী গবেষক ও তার স্নাতকোত্তর স্তরে পুত্রের সঙ্গের কথা বলে মনে হল যে দ্বিতীয় সাংকেতিকস্তর-প্রধান মানুষদের বোধহয় রসজ্ঞান ও মৈত্রিক আবেদন অন্যান্যদের থেকে কম।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডঃ দত্ত রায় ও তাঁর ছেলের সঙ্গে কথা বলার পর নিজের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হল। না, আমাদের দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রাবল্যের ফলে আমার 'তমস' সম্পর্কিত ধারণা তৈরী হয়নি। যুক্তিবুদ্ধির যথোচিত প্রয়োগ করছি আমরা। 'তমস' সম্পর্কে এক শ্রেণীর মৌলবাদী বিষোদ্গার করছেন। তাঁদের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরোধী ও তাঁদের পরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিপন্থী ধারণার বাহক ও প্রচারক কিম্বাটি, তাই এমন ভয় পাচ্ছেন। ঠিক তেমনি অন্য একদল, ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যসংহতির অভিলাষী মানুষ এই টেলিফিল্মটির মধ্যে তাঁদের ইচ্ছাপূরণের এক আত্মপ্রক্রিয়ায়, এক অযোঘ আয়ুধের অনুসন্ধান পেয়ে অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিচালিতদের সংখ্যা এদেশে বেশি। এঁদের সম্পর্কে আমাদের পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা ছাপা হয়েছে। এঁদের মনের ওপর 'তমস' তিলমাত্র ছাপ ফেলতে পারেনি বলেই আমাদের বিশ্বাস। কেননা এঁদের অনেকেই 'অবসেসনে' বা আবেশে আছেন, আর একদল 'ভিসিউসন' বা ভ্রান্তি রোগে ভুগছেন। টেলিফিল্ম-এর কোনো প্রভাব এদের মনে পড়বে না, পড়লেও এঁদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারে না। এঁদের মস্তিষ্কের যে কোষগুলিকে উদ্দীপ্ত করলে মনুষ্য পরাবর্ত সৃষ্টি হতে পারে, সেই কোষগুলো উত্তেজিত অবস্থায় অনড় হয়ে আছে। শৈশব থেকে এরা সাম্প্রদায়িক ব্যানধারণা দ্বারা অভিভাবিত হয়েছেন। আর যে সব সংগঠন সুপরিকল্পিতভাবে এই

অভিভাবক ক্রিয়া চালাচ্ছেন (ওঁদের বাক্তি বা শ্রেণিগত স্বার্থ কতদূর সিদ্ধ হবে জানি না), ওঁরা ওঁদের অনুগামীদের খেপিয়ে তুলতে পারবেন, 'তমস'-এর কালিমা তবু ওঁদের মুখে লেপন করার চেষ্টা হয়েছে—এই তমুহাতে। এক বছর আগেকার 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে উঠে পড়বে এবং 'তমস'-এর লেখক ও পরিচালকের ঐতিহাসিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর কটাক্ষপাত করা সহজ হবে। পুরনো ইতিহাস (বীভৎস ও হিংসাত্মক) মনে করিয়ে দেবার জন্য টিভি কিম্বের মত মাধ্যমের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। বরঞ্চ পাঠকদের জন্য প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘোচিত করা উচিত। ১৮ থেকে ২৫।৩০ বছরের ছেলেদের মনে এই শক্তিশালী মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভয়, ঘৃণা, হিংসা ও হত্যালীলার দৃশ্যগুলোই অনুপ্রবিষ্ট হবে ও তাদের প্রভাবিত করবে। তার পাশে মধ্যেলী মানবিকতার, মহানুভবতার নিদর্শন-মূলক রামধনুর মত মুহূর্তের জন্য রং ছড়িয়ে মিলিয়ে যাবে। এরই সঙ্গে দুই বিপরীতধর্মী উদ্দীপক মনকে চুকলে ভয়-ঘৃণা-ক্রোধ ইত্যাদি নঞর্থক, প্রক্ষোভ, সাহস, প্রীতি ও ভালবাসা জাতীয় সদর্থক প্রক্ষোভের চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করবে। কেননা, শৈশব থেকেই আমরা অনিশ্চয়তা, অসুরক্ষা প্রতিযোগিতা, নির্মম শোষণ-ভিত্তিক সমাজে বাস করি। আদিম মানুষের অজ্ঞানতাজনিত ভয়ের অভিব্যক্তি শৈশব থেকে কৈশোরে আমাদের মধ্যে অবস্থান করে। শিশু ও কিশোর ভাই ভূত প্রেত বাঘ সিংহ ইত্যাদির ভয়ের গল্প শুনে তাদের অন্তরে অবস্থিত ভয়ের মোকাবিলা করতে চায়। বিভীষিকা ভয় হিংস্রতার অভিব্যক্তিময় 'তমস' টিভি কিম্বের অনেকখানি জুড়ে আছে। এ ধরণের ছবি ছোটদের পক্ষে অতিকর। কিন্তু নির্মাতাদের উদ্দেশ্য এদিক থেকে ব্যর্থ বলে আমি মনে করি।

সিনেমায় 'আরোপেন্দুদের' শিকার হবার অভিজ্ঞতা আমার আছে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেকার অবিশ্বাস সন্দেহের সুযোগ নিতেন বৃটিশ রাজ। এখনও শাসক ও শোষকরা 'Divide and Rule'-এর নীতিতে বিশ্বাসী। এখন অতি গুরুত্বপূর্ণ কিম্ব টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হলে এটা দর্শকদের সৌভাগ্য বিশ্বাস। কিন্তু 'রামায়ণের' অবতারবাদ ও 'হোমির অবহোমির' অলৌকিক সত্যকাহিনী (?) পাশাপাশি 'তমস' অন্ধকারের অবসান ঘটানোতে খুব বেশি সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। এ নিয়ে আগামী সংখ্যায় আমার মত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। (চলবে)

অযাচিত সাহায্যে ফ্রেণ্ডস্ কাল্‌চারাল এসোসিয়েশন

সমাজে আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও পরস্পরনির্ভর। সমাজের সংগঠন যতই জটিল হয়, এই পারস্পরিক সহযোগিতার রূপ ততই পরোক্ষ হয়ে থাকে। সমাজব্যবস্থা সুস্থিত ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের হলেও এই পারস্পরিক নির্ভরতার প্রয়োজন থাকে। দুঃস্থ, বেকার ও দরিদ্র পরিবারের জন্য বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় সাহায্যের রীতিপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। মানুষের প্রতি দরদ ও সহানুভূতির স্রোত কিন্তু প্রায় সমভাবেই প্রবহমান থাকে।

রোগগ্রস্ত মানুষ, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সব সমাজেই নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। সরকারী ব্যবস্থা উন্নত দেশেও সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। বহু বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠান নানা স্থান থেকে অর্থ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য-সামগ্রী নিয়ে দুঃস্থ জনসেবায় নিযুক্ত আছে সব দেশে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-যেমন ঘরা, বন্যা, ভূমিকম্পে সাহায্যকারী অনেক নতুন সংস্থা গঠিত হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা এই সব সংগঠনের সাহায্য-হস্ত নিজের দেশের সীমানায় বদ্ধ থাকে না। আন্তর্জাতিক অনেক সংগঠনের নাম ও কার্যকলাপের কথা আমরা জানি। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যদান মানুষের সাধারণ ধর্ম বলে আমরা মনে করি। এ ব্যাপারে বিস্মিত হইনা।

ফ্রেণ্ডস কাল্‌চারাল এ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে যখন বিনাশর্তে সাহায্যদানের প্রস্তাব এলো তখন কিন্তু সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। একজন পূর্বপরিচিত ভদ্রলোক এ্যাসোসিয়েশনের সভ্য-সভ্যাদের পরিচিত করিয়ে দিয়ে জানালেন এরা একটি নবগঠিত সংস্থার প্রতিনিধি, পাভলভ ইনস্টিটিউটের অর্থাভাবের কথা শুনেছে এবং আমাদের ইনস্টিটিউটকে সাহায্য করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিস্মিত হবারই কথা। হিতৈষী গত কয়েক বছর ধরে আমাদের কথা ভাবছিলেন এবং নানারকমে সাহায্যের কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি একজন চল্লিশোর্ধ মার্কসবাদী এবং জানতাম যে পাভলভ বিজ্ঞান শুধুমাত্র ব্যক্তি চিকিৎসা নয়, অসুস্থ সমাজের চিকিৎসায়ও প্রযোজ্য। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ বাড়লো কিন্তু বিস্মিত হইনি। অচেনা অজানা কিশোরীদের নবগঠিত সংস্থা তাদের প্রযোজিত প্রথম নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানটির অভিনয় করতে চায় পাভলভ ইনস্টিটিউটের সাহায্যার্থে—একথা শুনে চমকিত হবারই কথা। আমরা তাঁদের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করতে রাজি হলাম।

তারপর কয়েকমাস তাঁরা তাঁদের নৃত্যনাট্য-এর মহড়া এবং আমাদের ইনস্টিটিউটের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিশোরীদের এই উৎসাহে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে, এ-নিয়ে আমরা চিন্তা করিনি। আমাদের বিস্ময় ও কারণ এই প্রয়াসের অভিনবত্ব। কোনো নব-সংগঠিত সংস্কৃতি সংস্থা নিজেদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা না করে অন্য একটি বিজ্ঞান-সংস্কৃতিমূলক সংস্থার সাহায্যের জন্য চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রম করেছেন—এ-ধরনের

কোনো ঘটনার কথা আমাদের জানা ছিল না। সাহায্যের পরিমাণ যত সামান্যই হোক আমাদের কাছে তা হবে অমূল্য।

১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) সন্ধ্যায় সিরিল ঘরে যখন গৌরপ্রসাদ শ্রীসমল বসু সাহায্যের পরিমাণ ঘোষণা করলেন তখন বিস্ময়ের অনুভূতি সকলকে ছাড়িয়ে গেল। এখনও কলেজ ইউনিভার্সিটির চত্বরে ঘোরাফেরা করে যে সংগঠনের সভ্যরা, সেই সংগঠন আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা। আরো অবাক হলাম যখন জানলাম যে তারা যে অনুষ্ঠান করছে তার জন্য বাকি খরচ হয়েছে প্রায় ঐ পরিমাণ টাকা। হয়তো এদের পেছনে অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা আছেন, এঁদের অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্য হয়তো কোনো পাওনাদার অনুরাগী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি রিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এদের অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিজেদের নতুন গড়া সংগঠন ও আমাদের পুরনো সংস্থার প্রতি আন্তরিক ভালবাসার জন্য এদের সকলের জন্য আমরা অকুণ্ঠ প্রশংসা করছি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তবে আমার বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস তুঙ্গে উঠল এই নতুন সংস্থার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার পর। নবোদ্গত শিশুকে হাঁটতে দেখলে এইরকম অবাক হতাম। সভ্যাগণ পরিবেশিত নৃত্যনাট্য 'বিরহ মধুর হল আজি' সত্যিই সুন্দর। খুবই অল্পদিনের রিহার্সালে নতুন শিল্পী নিয়ে এমন একটি সকল পরিবেশনের জন্য এঁরা অনায়াসে গর্বিত বোধ করতে পারেন। অপিতাকে বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর ত্রুটীহীন ব্যবস্থা ও অতিথিদের সমুচিত আপ্যায়নের জন্য সভানেত্রী শ্রীযুতী রীণা চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদিকা রেখা ঠাকুরকে অজস্র ধন্যবাদ। এঁদের বক্তব্য দিয়ে আমার কথা শেষ করছি :

"দীর্ঘদিনের ছড়ানো ছিটানো বন্ধুবান্ধবদেরকে খুঁজিয়ে নিয়ে একসঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ১৩৯৪ এর ১লা বৈশাখ গড়ে তুলেছি এ সঙ্ঘ। এখানে ভালবাসা, মনের আবিল ও স্ব-ইচ্ছার প্রকাশ যত আছে, উপায়ের পথ হয়তো তত নেই।" —সভানেত্রী (১৮. ৯. ৮৭)

"ছোট গাছের মধ্যে যেমন বিরাট মহীরুহের বীজ সুপ্ত থাকে আমাদের নবগঠিত সংগঠনের মধ্যে আমিও দেখতে পাই বিশালত্বের আশা" —সম্পাদিকা (১৮. ৯. ৮৭)

"উচ্চ আদর্শ এবং মহা উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে আমাদের এই ছোট প্রতিষ্ঠানটি যে বড় কাজ করতে নেমেছে তা হয়তো তার পক্ষে কিছুটা অবাস্তবসম্মত……। কিন্তু 'উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি' অর্থাৎ উদ্যমের দ্বারা কার্য সিদ্ধি হয় আর সেই উদ্যমকে সর্বতোভাবে প্রয়োগ করে আমাদের সকল সদস্য যে ভাবে আজকের এই বিপুল আয়োজনকে গড়ে তুলতে চলেছে তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।" —সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা (১৮. ৯. ৮৭)

এছাড়া সুপর্ণা দত্ত, সুস্মিতা চক্রবর্তী, সন্ধ্যা কর্মকার, মুক্তিনাথ মিত্র, সৌমেন হাজরা, কল্যাণ চ্যাটার্জী, অজয় ঘোষ, মহাদেব ঘোষ প্রভৃতি সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাই এই অনুষ্ঠান সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। এরা ছাড়াও যে দুজন নিঃস্বার্থ সহযোগীর কথা এইখানে না বললে বক্তব্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাঁরা হলেন শ্রীযুতী মিঠু মুখার্জী ও শ্রীযুক্ত অনিমেষ ভট্টাচার্য।

গ্রামীণ মানসিক স্বাস্থ্য—একটি সমীক্ষা

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উপরের ছবিটি দেখে অনেকে মনে করেছেন এটি বোধহয় কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ছবি। ঠিক তাই হয়—আমাদের রোগ (বিশেষতঃ মনের) সারানোর মধ্যযুগীয় পদ্ধতিগুলি সবই ধর্মীয় আচারের মতো, কিন্তু ছবিটি তা নয়।

পশ্চিমিরিয়া

বছর পাঁচেক আগে একটি রোগ এসেছিল আমাদের রাজ্যে—উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে। বিভিন্ন নাম ছিল রোগটির—কোথাও একে বলেছে ঝিন্‌ঝিন্, কোথাও ভিক্টো, কোথাও শিটাসলাগা। কিন্তু রোগটির পুস্তকের নাম 'কোয়ো সিনড্রোম' এবং সাধারণত এটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াবাসী ও মালয়দের মধ্যে দেখা যেতো। এই রোগটিতে রোগীর মনে হয় তার সমস্ত শরীর নিয়ন্ত্রণ থেকে অবশ হয়ে আসছে এবং অবশেষে শরীরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ; যার শেষ পরিণাম মৃত্যু। তাই এই অবিবাহিতা মেয়েটির গুজবগুলি বাইরের দিকে ওরে

—৪

রাখা হয়েছে যাতে এটি ভেতরে ঢুকে না যায় এবং মাথায় জল ঢালা হচ্ছে রোগ সারানোর জন্য। শহরে এই রোগের প্রকোপ কতখানি দেখা দিয়েছিল জানি না কিন্তু গ্রামে এই রোগের আতঙ্ক এমন ভয়াবহরূপে ছড়িয়েছিল যে, এই রোগে আক্রান্ত হবার খবর এসেছিল গ্রামের সমস্ত প্রান্ত থেকে মহামারীর মতো কিন্তু রোগটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি—ঝোড়ো হাওয়ার মতো এসে নাড়িয়ে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু ফেলে রেখে গেছে কিছু অভিজ্ঞতা।

চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রথম যে রোগীটির খবর আমরা পাই সে গ্রামের সম্ভ্রান্ত বাড়ির একটি শিক্ষিত ছেলে কিন্তু মানসিক দিক থেকে একটু দুর্বল। সে মাঠে চাষের তদারকিতে গিয়েছিল এবং সেখানে চাষীদের কাছে শুনেছে যে, এই রকম রোগ নাকি নতুন আমদানি হয়েছে, আশেপাশের গ্রামের অনেকের হয়েছে, কার হবে কোনো ঠিক নেই। এই কথা শুনে সে ঘরে চলে আসে আর কিছুক্ষণ ভাবতে ভাবতেই তার মনে হয় আমার এই রোগ হয়েছে, ফলে চিৎকার করে প্রায় হিস্টেরিয়ার রোগীর মতো মেঝেয় ছটফট করতে শুরু করে। বাড়ীর লোকেরা তৎক্ষণাৎ আতঙ্কিত হয়ে সারা শরীরে জল ঢালতে থাকে, জলনাদ গোরু বাঁধা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে যাতে এটি শরীরের ভেতরে ঢুকে না যায়। দেখতে দেখতে সারা গ্রামের লোক ভিড় জমায়। তারা সচকিত, আতঙ্কিত এবং ক্রমশ রোগটি ছড়াতে থাকে। দেখা যায় গ্রামের পোষ্টমাষ্টার, স্কুল শিক্ষক, সরকারি অফিসের কর্মচারী ইত্যাদি শিক্ষিত মানুষেরা নিজেদের বোধ, বুদ্ধি, বিবেচনা হারিয়ে ফেলেন। গুজব রটে যে মুখে ও গলায় চুন মাখলে এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। ব্যাপকহারে সবাই তাই শুরু করেন এবং বিনাপয়সায় চুন আট আনা, একটাকায় বিক্রি হয়। তাছাড়া তাবিজ, কবচ, জল-পড়া, হরিনাম সংকীর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণের আমদানি হয় রোগটির প্রতিরোধের জন্য—কারণ রোগের প্রচারের সঙ্গে এটাও প্রচার হয় যে মাথায় বা শরীরে জল ঢালা ছাড়া এর কোনো চিকিৎসা আদৌ নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন না যিনি এই চূড়ান্ত বোকামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। অথচ শিক্ষিত ও গ্রামের মাতব্বররা এই গুজবকে সমর্থন করলে সাধারণ মানুষ নির্দ্বিধায় রোগের ভয়াবহতা মেনে নেন। সেই সঙ্গে এই রোগের চিকিৎসার জন্য কেউ একবারের জন্যও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বা হাসপাতালে রোগী পাঠানোর কথা ভাবেন না। এবং এই রোগটি ছাড়ানোর মধ্যযুগীয় পদ্ধতিগুলি থেকে (জল ঢালা, জলনাদ বাইরের থেকে ধরে রাখা ইত্যাদি) নিরস্ত করার জন্য বেশ বেগ পেতে হয়। কারণ এই রকম প্রয়াসের সম্মুখীন হতে হয়—এই রোগটি নতুন এসেছে—আপনি কি এই রোগ আগে কখনও দেখেছেন। এবং যদি কিছু খারাপ হয় আপনি দায়িত্ব নেবেন। সুতরাং কোন তরুণ চিকিৎসক যার এ-ব্যাপারে ঠিক মতো ধারণা নেই, তাকে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে, অনেকক্ষেত্রে তিনি সাহস করে এগিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ রোগটি মনের ভয় থেকে সৃষ্টি হলেও অন্য কারণে রোগী হঠাৎ মারা যেতে পারেন, তখন চিকিৎসকের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। যাইহোক ক্রমশঃ প্রতিদিন বেশি বেশি করে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর আসতে লাগলো—রোগীর বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরী কি অবিবাহিত বা নবপরিণীত যুবক-যুবতী। পরবর্তীকালে শিক্ষিত মানুষদের কাছে এই নিয়ে জিজ্ঞাসা করায় (অর্থাৎ কেন তারা বিষয়টির বাস্তবতা ভেবে দেখেন নি) তারা স্বীকার করেছেন যে চতুর্দিকের প্রভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আমরা রোগটির হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নিতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমাদের ব্যবস্থা কতখানি কাজ করেছিল জানি না তবে রোগটির বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছিল এবং তাড়াতাড়ি বোড়ো হাওয়ার মতো রোগটিকে আমরা চলে যেতে দেখেছি। হতে পারে, অন্যান্য আরো পাঁচ জায়গার মতো স্বাভাবিকভাবে রোগটি সরে গেছে, কিন্তু একথা ঠিক যে, আমাদের প্রচার মানুষজনের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। হয়তো পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা তাদের কাজে আসবে।

সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ডেকে আমরা রোগটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম যে এই ধরনের রোগ কেন হয়, মস্তিষ্কে কিভাবে চিন্তাগুলি প্রভাব বিস্তার করে, পরস্পর পরস্পরকে কিভাবে অভিভাবিত করেন, রোগটিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা কিভাবে কাজ করে, আমরা কিভাবে রোগটিকে বাধা দিতে পারি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল জরুরীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেকটি কর্মী তার কাজের জায়গায় গিয়ে ব্যাপক প্রচারে নামবেন। চিকিৎসকেরা দল বেঁধে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্য করতে যাবেন। ইতিমধ্যে গ্রামের বড়ো বড়ো হাটগুলিতে (যেখানে জনসমাগম বেশি হয়) মাইকে প্রচার করা হবে যাতে এই রোগে অথবা কেউ আক্রান্ত না হন, অসুবিধা বুঝলেই স্বাস্থ্যকর্মী বা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এবং এই মর্মেই একটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে।

এবার সমীক্ষায় প্রাপ্ত মানসিক রোগের মূল তালিকাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

	রোগের নাম	প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
১.	Manic Depressive Psychosis (MDP)	৩৪
২.	Schizophrenia	৩৬
৩.	Mental Retardation (জড়বুদ্ধি)	৫০
৪.	Post Partum Psychosis	১
৫.	Involutional Melancholia	১
৬.	Acute Panic Attack	৪
৭.	Depression	৭
৮.	Dementia	৩
৯.	Organic Brain Syndrome (Acute)	২
১০.	Acute Phobia	১
১১.	Epilepsy	৬
১২.	Hyperactive [Minimal Brain Lesion]	২
১৩.	Impulsive	২
১৪.	Schizo-affective Disorder	৫
১৫.	Hysteria	১০
১৬.	Somatization	৯
১৭.	Paranoid State	১
১৮.	Acute Anxiety State	১

১৯.	Borderline Syndrome	৩
২০.	Behavioral Disorder (Childhood)	৭
২১.	Suicidal attack (Parasuicide)	৩
২২.	Suicide	১
	মোট	১৯২

সাধারণতঃ আমরা রোগের শ্রেণীবিভাগ করে থাকি প্রচলিত দুটি ব্যবস্থা থেকে। এর একটি আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ (International classification of Diseases—ICD-9) অন্যটি আমেরিকার শ্রেণীবিভাগ (Diagnostic & Statistical Manual, DSM-III)। এই দুটি শ্রেণী বিভাগের মধ্যে মিল আছে অনেকখানি, কিন্তু অমিলও আছে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ICD-9 মেনে চলার প্রবণতা বেশি কেননা এটির পেছনে আছেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.)। সে যাইহোক, আমরা আমাদের রোগের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ঐ দুটি বিভাগের সাথে সঙ্গতি রাখতে। কিন্তু তা করতে গিয়েও আমাদের বেশ অসুবিধে হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই আমাদের মনে হয়েছে এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ICD-10 তৈরী হয়েছে এমন খবর আমরা জানি এবং আশা করা হচ্ছে 1990 সালের মধ্যে এটি প্রকাশিত হবে। আরও শোনা গেছে এই শ্রেণীবিভাগে সর্বতভাবে চেষ্টা করা হবে বিভিন্ন অমিল ও মতানৈক্যগুলিকে মুছে ফেলার। সারা পৃথিবীর প্রবণতা ICD-কে মেনে নেবার দিকে এবং এটি তৈরি করার ক্ষেত্রে যে বিশেষজ্ঞরা থাকেন তাতে সমস্ত দেশই অল্প বিস্তর প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের দেশ থেকে এ ব্যাপারে কারা থাকবেন জানিনা এবং আমাদের এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাদের কানে পৌঁছাবে কি না জানি না তবে তাদের কাছে আমাদের আশা থাকবে যে আমাদের এই অসুবিধার কথা তারা ভেবে দেখবেন। বিশেষতঃ গ্রামীন সমাজে রোগ চিনতে গিয়ে আমাদের শ্রেণীবিভাগের জন্য অন্য মাত্রা (Dimension) যোগ করা উচিত। রোগগুলি আমরা পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করার সময় তার সুবিধা অসুবিধার কথা বলবো কিন্তু তার আগে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। যেমন একটি রোগের মধ্যে দু-তিনটি রোগের লক্ষণ, উপসর্গের অদ্ভুত মিশ্রণ। যার জন্য প্রথম প্রথম আমাদের রোগটিকে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয়েছে। আমরা জানি, মানসিক রোগে এমনটি হয়—ঠিক মুখ্য জ্বর, গৌন জ্বরের মতো—কিন্তু তা কখনই এমন হয় না যে গৌন উপসর্গগুলির ভিড়ে মুখ্য উপসর্গটি ঢাপা হয়ে যাচ্ছে এবং রোগটিকে চিহ্নিত করতে মুস্কিল হচ্ছে। এর থেকে আমাদের আরো সংশয় বেড়েছে যে রোগের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ ও রোগ চিনতে পারার ধারণাগুলি সর্বৈব সঠিক কিনা।

এইসব ধরণের মানসিক রোগের সাথে পরিবেশের তাপমাত্রার সরাসরি সম্পর্ক আছে। এমন বহু রোগী আমরা দেখেছি যাদের উন্নত অবস্থা বাড়ে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে তারা ভালো থাকেন। একথা পাঠ্য পুস্তকে উল্লেখ করা নেই এমন নয় কিন্তু এর প্রচার যে এতখানি তা জোর দিয়ে বলা নেই এবং এটা আমরা লক্ষ্য না করলে জানতে পারতাম না। এবং তাপমাত্রা এড়াবার জন্য রোগী নিজেই অনেকক্ষণ পুকুরের জলে স্নান করেন বা মাথায় জল ঢালেন এবং পরিবারের লোকও এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করেন।

রোগগুলির চিকিৎসার জন্য ওষুধ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকের নির্দেশিত ওষুধই ব্যবহার করেছি। এর মধ্যে ক্লোরপ্রোমাজিন, হ্যালোপেরিডল, অ্যামিট্রিপটালিন, লিথিয়াম ইত্যাদিই বেশি ব্যবহার করেছি। ওষুধগুলি ব্যবহার করার জন্য তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইনি। ওষুধের পরিমাণ নির্দেশিত পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তাতেই আমরা উল্লেখযোগ্য ফল পেয়েছি। সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করেছি ক্লোরপ্রোমাজিন ওষুধটি এবং আমাদের বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি বিজ্ঞানের আশীর্বাদ বলে আমাদের মনে হয়েছে। এইসব সত্ত্বেও সমস্ত রোগীদের সম্পূর্ণ চিকিৎসার ফল কি তা আমাদের জানা নেই। কারণ সবার ঠিকমতো চিকিৎসার দায়িত্ব আমরা পাই নি। মনে হয় মূলতঃ অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও অজ্ঞতার জন্য তারা চিকিৎসা শুরু করেও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। সেক্ষেত্রে একমাত্র জড়বুদ্ধি রোগী ব্যতীত অন্য যে সমস্ত বয়সের রোগী আমাদের কাছে ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করেছেন - তাদের ফল পেয়েছি চমৎকার ও উৎসাহব্যঞ্জক। সুতরাং আমরা আশাবাদী উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে অনেক মানসিক রোগীকেই অল্প আয়াসে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পারা যাবে। এটা একটা বড় ধরণের সামাজিক লাভ একথা নিশ্চই কেউ অস্বীকার করবেন না।

তালিকায় রোগের নামে বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করিনি বোঝার অসুবিধা হবে বলে। মোট এক লক্ষ জনসংখ্যায় আমরা মানসিক রোগী পেলাম ১১২ জন। আমাদের সমীক্ষা চলাকালীন (পাঁচ বছরেরও অধিক সময় ধরে) কয়েকজন মারা গেছেন [প্রায় ১২ জন]; তাদের আমরা সমীক্ষা থেকে বাদ দিয়েছি। তাছাড়া ধরে নিলাম কিছু আমাদের নজর এড়িয়েছে। সব মিলিয়ে সড়পড়তা দুশো পনেরো জনের বেশি হবে না। যাইহোক, স্বীকৃত দুশোটি মানসিক রোগী আমরা পেলাম এক লক্ষ জনসংখ্যায়। হিসাব করলে দাঁড়াল শতকরা ০·২ জন। অর্থাৎ এক হাজার জন মানুষ পিছু দুজন মানসিক রোগী আছেন। পাঠ্য-পুস্তকের হিসাব কিন্তু অন্যরকম। তারা বলছেন জনসংখ্যায় শুধু স্কিজোফ্রেনিয়াই আছেন শতকরা একভাগ অর্থাৎ একশোজনে একজন। তাছাড়া অন্যান্য রোগী তো আছেনই। সুতরাং সব মিলিয়ে হিসাব দাঁড়াবে ন্যূনতম শতকরা দুই থেকে তিনজন। অবশ্য এই হিসাব গ্রাম ও শহর মিলিয়ে যেখানে আমরা জানি যে, শহরে মানসিক রোগীর সংখ্যা গ্রামের থেকে অনেক বেশি। এবং পাঠ্যপুস্তকের হিসাব বিদেশের। আমাদের দেশে গ্রাম ও শহর মিলিয়ে কোনো সমীক্ষা হয় নি। সুতরাং আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে আছে আমরা জানি না। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অমিলের সম্ভাবনা কমই থাকে কিন্তু মানসিক রোগ আর্থ-সামাজিক ভৌগলিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের ওপর এমনভাবে নির্ভর করে যে, শুধুমাত্র বংশগতি দিয়ে বা সাধারণ পরিবেশ দিয়ে দুইস্থানের অবস্থাকে মেলানো যাবে না। সেই সঙ্গে অনেকে মনে করেন যে মানসিক রোগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে রোগ বলে চিহ্নিত সেই স্কিজোফ্রেনিয়া আধুনিক সভ্যতার অবদান। অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রজীবনের জটিলতায় স্কিজোফ্রেনিয়া বাড়ছে। সে কথা বিচার করলে পাশ্চাত্য জীবনের জটিলতা অনেক বেশি। সুতরাং সেখানে স্কিজোফ্রেনিয়ার সংখ্যাও বেশি। তাঁদের মতামতকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ আমাদের সমীক্ষাতেও আমরা দেখলাম অন্যান্য ডিপ্রেসিভ সাইকোসিসের তুলনায় স্কিজোফ্রেনিয়া সংখ্যায় কম। যাইহোক, আমাদের হিসাব অনুযায়ী মানসিক রোগীর সংখ্যা শতকরা ০·২ জন। এখানে একটি বিষয় বলে রাখা দরকার প্রয়োজন তা হলো এই মানসিক রোগীদের মধ্যে নিউ-

যোগসিলে ভুগছেন এমন রোগীরা সংখ্যায় কম। কারণ গ্রামীন মানসিকতায় বদ্ধ উন্মাদ বা পরিবেশের সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ছেদ করার আগে পর্যন্ত গ্রামের মানুষ তাকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেন ও তাকে প্রথম অবস্থাতেই মানসিক রোগী হিসাবে চিহ্নিত করেন না এবং সেই মুহূর্তে তার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। সেইসঙ্গে পরিবেশের সাথে যোগাযোগ থাকলে রোগীও মনে করেন না যে তার চিকিৎসা প্রয়োজন। গ্রামীন সামাজিক জীবনের জটিলতা কম একথা আগেই বলেছি সুতরাং সুস্থ অবস্থা থেকে বদ্ধ উন্মাদ হওয়ার মাঝামাঝি বিভিন্ন দশায় মানুষ তার চারপাশের পরিবেশের সাথে ক্ষীণ যোগাযোগ রেখেও বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেন। সেইরকম কিছু রোগী হয়তো আমাদের চোখ এড়িয়েছে কারণ ব্লকের সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের মানসিক অবস্থা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি তাও আমরা তাদের চিহ্নিত পাগল ছাড়াও খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি। সুতরাং আমরা বলতে পারবো না যে ব্লকটির মানসিক রোগীর সংখ্যা আমাদের সমীক্ষার থেকে বিরাট কিছু হেরফের হবে।

পৃথক পৃথক ভাবে রোগগুলির আলোচনায় এবার আমরা যাবো। সর্বপ্রথম আসবে Mental Retardation বা জড়বুদ্ধি সম্পন্নদের কথা। তালিকা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের প্রাপ্ত মানসিক রোগীর সংখ্যার তালিকায় জড়বুদ্ধি সম্পন্ন রোগীদের সংখ্যাই বেশি—পঞ্চাশ জন। যদি আরো ভালোভাবে খুঁজে দেখা যায়, তাহলে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন এই দুই-এর মধ্যবর্তী স্থানে হয়তো আরো কিছু জনকে পাওয়া যাবে। যাদের কেউ রোগী হিসেবে দেখেন না—মোটাবুদ্ধি বা 'মোটাহুশ' বলে চিহ্নিত করেন। যাইহোক এই সংখ্যাটি আমাদের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে মিলছে যে, গ্রামে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন রোগীর সংখ্যা বেশি, এর বেশির ভাগই শিশু ও কিশোর। জড়বুদ্ধিতার কারণ আছে হাজার কি তারও বেশি। আর অনেক ক্ষেত্রেই এই কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। সুতরাং আমাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি এদের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা। শুধু এইটুকু বলতে পারবো যে তাদের জড়বুদ্ধিতার পরিমাণ বেশি কি কম। মোটামুটিভাবে বলা যায় এদের বেশীরভাগ মাঝারী ও কম ধরণের। আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয় গ্রামে জড়বুদ্ধির সংখ্যা কেন বেশি। এর কারণ সাধারণভাবে যা মনে হয় তা হলো শিশুর গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর যতখানি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন তা নেওয়া হয় না। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রসবকালীন যত্ন। গ্রামে এখনও ষাট থেকে পঞ্চাশভাগ প্রসবে সহায়তা করেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইমায়েরা। সুতরাং দীর্ঘ প্রসব ও কুঁকিজনক প্রসবে (বিশেষতঃ প্রথম গর্ভাবস্থায়) মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ কম হলে (পাঁচমিনিটের বেশি হলেই) যে নবজাতকের স্থায়ী ক্ষতি হয় এ বোধার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই কেন কিছু শিশু শুধুমাত্র প্রসবকালীন যত্নের অভাবেই জড়বুদ্ধি হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভূমিষ্ট হয়। এছাড়া কারণগুলির মধ্যে আছে শৈশব ও কৈশোরের যত্ন ও প্রশিক্ষণের অভাব। গ্রামের মানুষের কাছে এ-ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা কখনও বোঝানো হয়নি। প্রসঙ্গত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরণের রোগ আমরা বেশি দেখছি। তার কারণ আমরা সঠিক জানি না তবে এই সমাজের সংরক্ষণশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশি যার কারণে তারা গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালীন সময়ে মায়েদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসতে চান না এবং এদের অধিক আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ চালু আছে (Consanguinity), কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে জড়বুদ্ধি

শিশুর মা বয়স্ক অবস্থায় শিশুটি প্রসব করেছেন, প্রকৃত ইতিহাসে পেয়েছি। একটি ক্ষেত্রে কষ্টকর প্রসব, গর্ভাবস্থায় হামে (Measles) ও শুটি বসন্তে আক্রান্ত হবার ইতিহাস আমরা পেয়েছি। জড়বুদ্ধিদের শতকরা নব্বুই ভাগেরই মৃগী রোগ আছে। সুতরাং মৃগী নামে তালিকায় যে রোগীর সংখ্যা দেওয়া আছে তাদের কারোর জড়বুদ্ধিতা নেই এইরকম ধরতে হবে। প্রসঙ্গটি শেষ করা যায় এই বলে যে চিকিৎসার ব্যাপারে হতাশাজনক অবস্থা এদের সব রকমের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করেছে। পীর, ফকির, তাবিজ, কবচ থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দৌড়া-দৌড়ি করা পর্যন্ত বাবা মা'রা করেছেন। ঐটুকু তাদের সামর্থ্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু কোথাও কোনো ফল না পেয়ে, তারা আশা ছেড়ে দিয়েছেন তাদের সন্তানের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মনে রেখেও। আমাদের সমীক্ষায় প্রথম প্রশ্নই তারা করেছেন সত্যিকারের উপকার কিছু হবে কিনা, নইলে শুধু শুধু চেষ্টা করে অর্থ ও শ্রমের অপব্যয় তারা করতে রাজি নন।

এরপরেই আসা যাক স্কিজোফ্রেনিয়ার কথা। এতে চিন্তাভাবনার বিশৃঙ্খলা হয় (Thought Disorder)। লক্ষণ উপসর্গগুলির মধ্যে থাকে অলীক দর্শন, অলীক শ্রবণ, পরিবেশের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, কেউ বা কারা তার পেছনে ষড়যন্ত্র করছে তার ক্ষতি করবে এমন চিন্তা করা। যাই হোক গ্রামে স্কিজোফ্রেনিকের সংখ্যা কম একথা আগেই বলেছি, সেই সঙ্গে আরও একটি ব্যাপার হলো এই স্কিজোফ্রেনিয়াদের অধিকাংশেরই জড়বুদ্ধি আছে। সাধারণতঃ এমন যে পাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু কিছু সংখ্যা পাওয়া যায়, যারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। এই স্কিজোফ্রেনিকদের অধিকাংশেরই বংশগতিতে এই রোগের ইতিহাস পূর্বপুরুষদের মধ্যে পাওয়া যায় নি এবং অধিকাংশেরই এই রোগটি শুরুর আগে একটি উল্লেখযোগ্য পারিপার্শ্বিক ঘটনা আছে। এই ধরণের রোগের উৎপত্তিকে আমরা বলি Reactive বা প্রতিক্রিয়ামূলক। সুতরাং এখানে এই প্রতিক্রিয়ামূলক স্কিজোফ্রেনিকের সংখ্যাই বেশি। এদের বেশ কিছুজন চিকিৎসায় উৎসাহিত হয়েছেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় ফললাভ করেছেন। কিন্তু প্রাথমিক উন্নতি লাভ করার পর চিকিৎসায় ছেদ পড়েছে, এদের সংখ্যাই বেশি। শুধুমাত্র একটি রোগীনির কথা উল্লেখ করছি যার মা আমাদের সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত যোগাযোগ রেখেছিলেন। অর্থাৎ এই পাঁচ বছরের মধ্যে যখন যেমনভাবে যা পরামর্শ তাদের দেওয়া হয়েছে তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। রোগীনিটি এখনও সুস্থ অবস্থায় একটি মেয়ে নিয়ে সংসার করছেন। এই প্রসঙ্গটি শেষ করা যায় এই কথা বলে যে, ক্রনিক স্কিজোফ্রেনিকদের পুনর্বসতি (Rehabilitation)—যা নিয়ে আমাদের গভীর হতাশা ও উদ্বিগ্নতা আছে তা গ্রামের সামাজিক জীবনে অনেক ভালো। শহরে আমরা দেখেছি যদি একমাত্র সন্তানের স্কিজোফ্রেনিয়া হয় তাহলে মা বাবার কি পরিমাণ উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা হয় যা আমাদেরও স্পর্শ করে। গ্রামে তা আমরা অন্যরকম ভাবে অনুভব করেছি তার কারণ শহরের জীবনে অধিকতর নিরাপত্তাহীনতা এবং গ্রামের জীবনে অধিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার ও বাঁচিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। এখনও আল্লা বা ভগবানে তারা বিশ্বাস করেন সুতরাং ঐ শক্তি যাকে যেমন গড়েছেন তা মেনে নিতে হবে। তাকে সামর্থ-মতো সাহায্য করতে হবে এই মনোভাবও এদের মধ্যে প্রচলিত। সেইসঙ্গে সুবিধা হয়েছে গ্রামের

সহজ জীবনযাপন থাকায় ও সামাজিক জীবনের জটিলতা অনেক কম থাকায়। আর কতোদিন গ্রামীন সমাজ এইসব ক্রনিক স্কিজোফ্রেনিকদের সুযোগ দেবে আমরা জানিনা কিন্তু এখনও এদের মমতা রোগীদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ।

এরপর আসা যাক ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিসের (MDP) কথায়। এই রোগের মূলে আছে ভাব-সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা (Mood Disorder) এবং পর্যায়ক্রমে অতি নিস্তেজনা (বিষণ্ণতা) ও অতি উত্তেজনায় (বেপোয়াতা) রোগটির প্রকাশ ঘটে। গ্রামের সমাজে তুলনামূলকভাবে এই রোগ বেশি দেখা যায়। আমাদের পরিসংখ্যানেও তাই পেয়েছি। কারণ হিসাবে পাশ্চাত্যপন্থীরা মনে করেন যে, গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রাথমিক সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য আছে। অর্থাৎ তাদের মস্তিষ্কে প্রকোষ্ঠের প্রাধান্য বেশি। তাই এই নিয়ে বিশৃঙ্খলা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। তুলনায় স্কিজোফ্রেনিয়ারা হল সেইসব মস্তিষ্কের অধিকারী যাদের দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর বেশি প্রাধান্য পায়। যাই হোক ব্যাপারগুলি এতোখানি সংশ্লিষ্ট না করেও বলা যায় যে, গ্রামের মানসিক উপদ্রব পীড়িত রোগীদের মধ্যে অধিকাংশেরই অল্পবিস্তর ভাবের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বিশেষতঃ পল্লীর আচার আচরণের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কি সাধারণ মানুষের মধ্যে সামন্ত রাজা-মহারাজা হবার বহুলতায়। এদের মধ্যে কিছুজন আছেন যারা উন্মাদের স্তরে পৌঁছানি (Hypomanic)। এবং এদের চিকিৎসার কথা রোগী বা পরিবেশের লোকজন কেউই ভাবেন না। সাধারণতঃ এক্ষেত্রেও প্রাথমিক রোগটির তীব্র উন্মত্ত অবস্থাটুকু সামলে উঠলেই আর চিকিৎসার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন না। আর রোগী যখন বিষণ্ণ দশায় (Depressive Phase) থাকেন তখন তার নিস্তেজিত অবস্থা পরিবারে শান্তি আনে তাই এই অবস্থায় চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অনুভবের প্রশ্নই আসছে না। তবে যে ক'জন রোগী আমাদের কাছে ঠিকমতো চিকিৎসিত হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই ভাল আছেন।

আত্মহত্যার চেষ্টা ও আত্মহত্যা ঘটানোর কয়েকটি ঘটনা ঘটছে বিশেষত মানসিক রোগের অবস্থা বিচার করে। সাধারণতঃ সব এই ধরণের ঘটনাকেই আমরা মানসিক বিশৃঙ্খলাজনিত বলে ধরে থাকি। আমাদের এই পাঁচ বছরের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনার খবর পেয়েছি মোট নয়টি। কিন্তু একটি ক্ষেত্রেই ইতিহাস নিয়ে জানা গেছে যে মহিলাটি আত্মহত্যার আগে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—Depressionএ ভুগছিলেন। এ ব্যাপারটি তার বাড়ির লোকজন জানা সত্ত্বেও, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। বাকী আটটি ঘটনার মধ্যে—দুটি ঘটনা আত্মহত্যা বলে চালানো হয়েছে কিন্তু আমাদের সন্দেহ ঘটনা দু'টি হত্যা। আর বাকি ছয়টির সঙ্গে সরাসরি মানসিক রোগের কোনো সম্পর্ক নেই। হঠাৎ করেই ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে। আত্মহত্যার চেষ্টার আমরা খবর পেয়েছি তিনটি। কিন্তু বাস্তবিক এই সংখ্যা আরও বেশি কারণ লোকলজ্জা ও কলঙ্কের ভয়ে এই কথা কেউ প্রকাশ করতে চান না। তবে যে তিনটি ঘটনা আমাদের তালিকায় এসেছে তার সবকটি ঘটেছে বৈকল্যাবাধজনিত অসুস্থতায়।

মৃগীর (Epilepsy) সংখ্যা আমাদের তালিকায় আছে ছয়টি। এরা কেউ কেউ নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার করেন—কেউ করেন না। এই মৃগীগুলির সবকটি বড় ধরণের যাকে আমরা Grand Mal

Type বলে থাকি। ছোট ধরনের কোনো মৃগী যাকে আমরা Petit Mal Type বলি বা অন্য কোন ধরনের মৃগী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। হতে পারে এমন রোগী থাকলেও তার যে চিকিৎসার প্রয়োজন এমন কথা কেউ ভাবেন নি। অনেকেরই ধারণা আছে মৃগী ঈশ্বরিক শক্তির ভর (Possesion) এবং ওষুধ খেলেও এ রোগ সারবে না। এমন উদাহরণ কেউ কেউ দেখিয়েছেন যে ওষুধ খাওয়ানোর পরও মৃগী অব্যাহত আছে। সেখানে আমরা বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে ওষুধ তারা ব্যবহার করেছেন ঠিকই কিন্তু অনিয়মিতভাবে। এই মৃগীগুলির সাথে কোনো মানসিক রোগের ঘনিষ্ঠতা আমরা খুঁজে পাইনি। শুধু পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেছেন যে এই রোগীরা একটু রাগী প্রকৃতির হয় এবং মাঝে মাঝেই মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে থাকে, কারোর কথা শোনে না, আনমনে হয়তো কোথাও চলে যায় ইত্যাদি। একজন রাজবংশী রোগীর কথা আমরা জানি যে আমাদের নির্দেশিত ওষুধ ব্যবহার করতো। তার পেশা ছিল মাছ ধরা এবং জলে ডুবে সে মাছ ধরতো। উপর্যুপরি নিষেধ সত্ত্বেও দেড় বছরের মাথায় সে ওষুধ বন্ধ করে দেয়। বলে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার জন্য সে আর ওষুধ খেতে পারছে না। অথচ সে মদ ও গাঁজায় বেশখানিকটা পয়সা উজার করতো। যাই হোক, একদিন তার নিস্পন্দ দেহটা সঙ্গীরা হাসপাতালে নিয়ে এল। যথারীতি জলে ডুবে মাছ ধরার সময় তার ফিট এবং চিৎকার শুনে সঙ্গীসাথীরা ছুটে আসে কিন্তু ততক্ষণে সে অনেকখানি জলে তলিয়ে গেছে।

আমরা বৈকল্যবায়ু পেয়েছি দশটি। সাধারণতঃ বলা হয় All of us are hystrionic অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু তা কখনই পরিবেশের সাথে বেমানান নয়। সকলেই আমরা একে অপরের এই মৃদু টুকু সহ্য করে নিই। আমার যে কোনো পিছিয়ে পড়া সমাজে এই রোগ লক্ষণ বেশি দেখা যায়। সুতরাং আমাদের জীবনযাত্রায় এই ধরনের রোগ-লক্ষণ সমেত রোগী দেখেছি সর্বাধিক। তাদের তালিকাভুক্ত করতে গেলে পুরো তালিকার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এখানে বৈকল্যবায়ু বলতে এমন রোগীদের আমরা নির্বাচন করেছি যারা রোগটিতে ক্রমাগতভাবে অন্তত তিন মাস ভুগেছেন। এই রোগীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা এবং অবিবাহিতা বা সদ্যবিবাহিতা। ভূত বা অপদেবীর শক্তিতে পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে তিনটিতে। কয়েকজনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বিবাহের পর স্বামীর ঘর মানিয়ে নিতে না পারার জন্য এমনটি ঘটেছে। এদের মধ্যে দুজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে হয়েছে। বাকিরা বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাতেই সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু এদের মধ্যে কেউই পরবর্তীকালে বড়ো ধরণের কোনো মানসিক রোগের শিকার হন নি।

আর এক ধরনের রোগ পেয়েছি নয়টি। যাকে পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় বলা হয় Acute Organic Brain Syndrome, যার আগের নাম ছিল Delirium বা প্রলাপ। এই নয়টির মধ্যে ছুটি ঘটেছে উদরাময় রোগের চিকিৎসার পর। তিনটি ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগের জন্য এই রোগ দেখা গেছে। বাকি ক'টির কারণ আমরা জানতে পারিনি। এই রোগীগুলি সব কজনই আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছেন তীব্র অবস্থায়। এবং সেই সময়টুকুতে তাদের সামলানো ছিল বেশ কষ্টকর ব্যাপার। পুরো

হাসপাতাল ছুড়ে তারা এক ভয়াবহ অবস্থা তৈরী করেছিলেন। তার বাড়ীর লোকজনের অজ্ঞতায় তাদের এই অসুখ আরও বেশী তীব্রতায় উপস্থিত হয়েছিল। একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সবক্ষেত্রেই রোগীরা দু'তিনদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের কারোর কোনো বড় ধরণের মানসিক রোগ দেখা যায়নি। একটি ক্ষেত্রে (রোগী ছিলেন আমাদেরই একজন স্বাস্থ্যকর্মী) রোগী আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে ছুটে বাড়ি চলে যান। তাকে ধরে রাখা যায় নি। অবশ্য বাড়ি গিয়ে পরের দিনই তিনি সুস্থ হয়ে যান।

শুধুমাত্র বিষণ্ণতায় ভুগছেন (Depression) এমন রোগী আমরা পেয়েছি সাতজন। এরা প্রত্যেকেই মধ্যবয়সী, এদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা ও দুইজন পুরুষ। এদের তিনজনের বিষণ্ণতা প্রতিক্রিয়ামূলক অর্থাৎ রোগ হবার আগে কতগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার ইতিহাস আমরা জেনেছি। এবং এইগুলি তাদের মনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে বলে রোগী স্বীকার করেছেন। একজন ছাড়া চিকিৎসার পর সকলেই ভালো হয়েছেন। একজন চিকিৎসা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ওষুধ খান নি। তিনিও সুস্থ হয়েছেন। গড়পড়তা দু'বছর থেকে তিনবছর এদের ওষুধ গ্রহণ করতে হয়েছে।

সোমাটাইজেশন অক্ষ্ম আলোচনা করার পরও আমরা তালিকায় দেখিয়েছি যে নয়টি সোমাটাইজেশন-এর রোগী আমরা পেয়েছি। এই নয়টি সোমাটাইজেশন এমন পর্যায়ে গেছে যে তাদের তিনমাসেরও বেশী সময় ধরে ভুগতে হয়েছে। কয়েকজন রোগ-উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। উপসর্গগুলির উপশম হলে তাদের বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে তারা অন্যান্য আরো কয়েক জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন। আবার আমাদের কাছেও এসেছেন। সামর্থ্যমত পরীক্ষানিরীক্ষা করে (Laboratory Test) তাদের অন্য কোনো গঠনতন্ত্রের বিশৃঙ্খলাও আমরা খুঁজে পাইনি। এদের মধ্যে বেশির ভাগই অভিযোগ করেছেন স্নায়ু-ঘটিত অসুবিধা। সবাই যে আমাদের চিকিৎসায় সেরে গেছেন এমন দাবী আমরা করছি না। তবে তারা আমাদের পুরানো বন্ধুর মতো মাঝে মাঝেই আমাদের কাছে উপসর্গ নিয়ে পরামর্শের জন্য আসতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কয়েক ধরণের রোগ আমরা পাইনি যেমন ড্রেজ অপব্যবহার ও নির্ভরতা (Drug Dependence), যৌনবিকার (Psychosexual Disorder), Psychosomatic Disorder ইত্যাদি। ড্রেজ-নির্ভরতা নিয়ে সারা পৃথিবী তোলপাড় হচ্ছে কিন্তু আমাদের ধারণা এই রোগটি এখনও শহরেই সীমাবদ্ধ আছে। নেশার মধ্যে গ্রামে, তাড়ি বা গাঁজানো ভাত রসের ব্যাপক প্রচলন আছে বিশেষত গ্রীষ্মকালে। সব বয়সের লোকই এগুলি খান কিন্তু তা নেশা বা নির্ভরতার পর্যায়ে যায় না। গেলেও তা মানসিক নির্ভরতার পর্যায়েই থাকে। ঘরে তৈরি মদের ব্যবহার গ্রামের নীচুশ্রেণীর মধ্যে আছে কিন্তু তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ বেশ কমই থাকে। এছাড়া অন্য কোনো ড্রেজ ব্যবহার (নিয়মিত) করার সুযোগ গ্রামের মানুষের নেই। অন্য রোগগুলিও বোধহয় সত্যতার অভিশাপ। যাইহোক এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। বলা যায় যে Psychosomatic Disorder, যার কারণ হিসেবে বলা হয় যে—দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ ফেলে (Autonomic Nervous System) এমনটি ঘটাচ্ছে; তা গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে

সোমাটাইজেশন এর মাধ্যমে অর্থাৎ Voluntary Nervous System-এর প্রভাবে শরীরে বিভিন্ন অংশে উপসর্গ তৈরি করছে। সুতরাং শহরের মানুষের জন্য Psychosomatic Disorder থাকলে গ্রামের মানুষের আছে সোমাটাইজেশন ডিসঅর্ডার। কিন্তু রোগের ভয়াবহতার বিচারে গ্রামের মানুষ অনেক ভালো অবস্থায় আছেন কেন না তাকে বহন করেছে অনেক নির্দোষ ধরনের রোগ। কিন্তু শহরের মানুষ তার সভ্যতার, অগ্রগতির টেনশনের শিকার হচ্ছেন।

ছোটো ছোটো বিভাগগুলি বিস্তারিতভাবে আর আলোচনা করছি না, শুধু দুটি বিভাগের কথা বলে অধ্যায়টি শেষ করবো। এই দুটি বিভাগ নিয়ে আমাদের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগে আমরা অসুবিধায় পড়েছি। এর মধ্যে প্রথম হলো তীব্র আতঙ্ক (Acute panic attack)। যে চারটি রোগী আমরা পেয়েছি তাদের প্রত্যেকেই নানা আতঙ্কে উন্মাদ হয়েছেন। সাধারণতঃ প্রচলিত তীব্র ভয় বেশি মাত্রায় অস্বাভাবিকভাবে বিশৃঙ্খল হলেও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন এবং নিজের অবস্থাটা বোঝার মত ক্ষমতা তার থাকে। কিন্তু এখানে তীব্র আতঙ্ক এমন এক পর্যায়ে গেছে যে রোগী সেই সময়ের জন্য বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। অবশ্য তা অল্প সময়ের মধ্যেই (কয়েকদিন থেকে কয়েকমাস) সে সুস্থ হয়েছে এবং পরবর্তীকালে কোন বড় ঘটনা তার ঘটেনি; গণ্য করার মতো পারিপার্শ্বিক ঘটনাও কিছু পাওয়া যায় নি। সুতরাং এইসব লক্ষণ-উপসর্গগুলি থেকে আমাদের সংশয় থেকে গেছে ওই রোগের শ্রেণীবিভাগ কি হবে। দ্বিতীয় যে জিনিষটি আমাদের অসুবিধায় ফেলেছে তা হলো, Borderline Syndrome অর্থাৎ প্রচলিত কোনো রোগের মধ্যে এদেরকে আমরা ফেলতে পারছি না। অথচ মানসিক বিশৃঙ্খলার লক্ষণ-উপসর্গ প্রায় সবই এতে আছে। অথচ এরা বদ্ধ উন্মাদ নন। তবে যে কেউ এদের সাথে মিশলে বা ব্যবহার করলে বলবে লোকটি স্বাভাবিক নন। সবচেয়ে বড়ো কথা বাড়ির লোকজনও চাইছেন এর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কারণ মাঝে মাঝেই সে এমন আচরণ করছে যে, তা দেখে উন্মাদের মতোই লাগছে। আবার মাঝেমাঝে সম্পূর্ণ সুস্থ লোকের মতো ব্যবহার করছে। এইরকম সীমান্তবর্তী রোগী আমরা পেয়েছিলাম দুইটি। এদের চিকিৎসা করাও বেশ সমস্যার ব্যাপার ছিল। কারণ রোগীদের প্রায় সবার ধারণা ছিল যে তাদের কিছু হয়নি শুধু শুধু তারা ওষুধ কেন খাবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এদের মানসিক বিশৃঙ্খলা ঘটেছে ধীর গতিতে। আরও একটি ব্যাপার হলো এদের অনেকেরই লক্ষণ-উপসর্গগুলি সরে সরে গেছে। হয়ত প্রথম কয়েকদিন তাদের মানসিক অবস্থা যে উপসর্গগুলি নিয়েছিল, পরবর্তী দিনগুলিতে তার পরিবর্তন হয়ে অন্যান্য উপসর্গ এসেছে। এদের মধ্যে একজনই পরবর্তীকালে ভেঙে পড়েছেন স্কিজোফ্রেনিয়ার দিকে, বাকি সব কজনই একই রকম অবস্থায় কখনো ভালো কখনও মন্দ—এইভাবে জীবন কাটাচ্ছেন।

Schizo-affective বলতে যে মিশ্র অবস্থার কথা আমরা বোঝাতে চেয়েছি যাদের দুটি বড়ো ধরনের উন্মাদ অবস্থা চিন্তার বিশৃঙ্খলা ও ভাবের বিশৃঙ্খলা—এই দুই-এর লক্ষণ ছিল। মাঝে মাঝেই তারা মানসিক রোগীর মতো উৎক্রম করেছেন আবার মাঝে মাঝে সমস্ত সমাজ থেকে; পরিবেশ থেকে সম্পর্ক ছুটিয়ে নিজের জগতের মধ্যে বন্দী থেকেছেন। এদের সবার যে একই ধরনের লক্ষণ ছিল তা

নয়, তবে সবার মধ্যে মিল এইটুকুই ছিল যে—তাদের কোনো একটি বিভাগে নির্দিষ্ট করে ফেলা যাবে না।

বাচ্চাদের আচরণগত ত্রুটি, অত্যাধিক চঞ্চলতা, জিনিষপত্র ভেঙে ফেলা, ক্ষতি করা ইত্যাদি কয়েকজন আমরা পেয়েছি। এদের রোগের ইতিহাস তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। এদের চিকিৎসার ব্যাপারে বাপ-মা-এর তেমন আগ্রহ ছিল না যখন তারা বুঝতে পেরেছেন এদের পেছনে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হবে। নিজেরা আমাদের কাছে পরামর্শ দিয়েছেন এদের ছেলেধরেদের পোলপাল, বয়স হলে আপনি আপনি কেটে যাবে।

Dementia এই প্রসঙ্গটি বলে আলোচনা শেষ করবো। একে Chronic Organic Brain Syndromeও বলা হয়। সাধারণতঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটে। আক্রান্ত রোগীর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি, আচারব্যবহার, বিচারবিবেচনা ইত্যাদি ক্ষমতাগুলি চলে যায়। আমরা এমন রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলাম তিনটি ক্ষেত্রে। তিনটিই ছিল বৃদ্ধত্ব, তবে তুলনায় একটু কম বয়সে। এবং অন্য কোনো শারীরিক রোগের সাথে এদের সম্পর্ক ছিল না। হয়তো গ্রামের মধ্যে খুঁজলে আরও কয়েকজন এমন রোগী পাওয়া যেত কিন্তু চারপাশের মানুষ এটাকে মানসিক বিশৃঙ্খলা বলে মনে করেন না বলেই আমাদের মনে হয়। হয়তো তারা মনে করেন এগুলি বৃদ্ধত্বের লক্ষণ—হাতের পাঁচটা আঙুল পাঁচ রকমের।

এই যে মানসিক রোগীদের নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তাদের গড়পড়তা বয়স কুড়ি থেকে পঞ্চাশের মধ্যে; শুধুমাত্র অভিবৃদ্ধিগ্রস্ত রোগীদের বয়স একটু বয়সের দিকে এবং তা গড়ে বলা যায় হবে। মানসিক রোগীদের মধ্যে অন্য কোনো শারীরিক উপসর্গ আমরা পাই নি। বিশেষতঃ যা বলা হয় যে, যক্ষা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ এদের বেশি থাকে। কিন্তু গ্রামের পরিবেশের জন্য হোক বা তুলনামূলকভাবে সেবা-যত্ন পাওয়ার জন্যই হোক একজন মানসিক রোগীও আমরা পাই নি যার যক্ষা বা অন্য কোন ধরনের শারীরিক রোগ আছে; উপরন্তু বলা যায়, যেভাবে তারা শরীরের উপর অত্যাচার করেন তাতে কোনো শারীরিক রোগ যাতে যাতে হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তাই একটি একটি ভাবনার বিষয় যে গুরুতর মানসিক রোগের ক্ষেত্রে রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunological Status) বৃদ্ধি পায় কিনা।

উপসংহারের বদলে :

পুরো আলোচনাটিকে ছোটো করতে চাইলে নিম্নলিখিতভাবে আমরা এটাকে সাজাতে পারি। এর বাইরেও যে কিছু কথা নেই এমন নয়। তবু মূল কথাগুলি মোটামুটি এইরকম। আর আগেই আলোচনা করেছি-যে মানসিক রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে সবকটি স্তরকে যে চিন্তাভাবনা হচ্ছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা আমাদের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করবো পরবর্তী সংখ্যায় এবং তাতে গ্রামীণ মানসিক স্বাস্থ্যই প্রাধান্য পাবে।

গ্রামে মানসিক রোগের সংখ্যা প্রচলিত ধারণার চেয়ে অনেক কম। সুতরাং মানসিক রোগ বাড়ছে

একথা শহরের ক্ষেত্রে সত্যি হলেও গ্রামের ক্ষেত্রে নয়। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার এই জন্য যে মানসিক রোগীদের জন্য কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিলে তা অধিকতর ব্যবহৃত হবে না। আর শহরের তুলনায় এত কম রোগী কেন এটা ঠিকমত জানতে পারা গেলে সুযোগ সামর্থ্যমত শহরে আমরা সেই পরিবেশ তৈরী করার জন্য চেষ্টা করতে পারবো।

এই সমীক্ষায় একথা উল্লেখযোগ্য যে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশের প্রতিকূলতা, অনিশ্চিত পেশা সাম্প্রদায়িক মনমালিন্য, অশিক্ষা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও মানসিক রোগীর সংখ্যা বেশী নয়। উল্টে এই কথাটাই আমাদের সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য করছে যে স্বাভাবিক প্রতিকূলতার মধ্যে মানসিক স্বাভাবিকতা বাড়ে এবং মানসিক রোগ কমে।

ক্রনিক স্কিজোফ্রেনিকদের পুনর্বসতির জন্য গ্রামের সমাজ জীবন তুলনায় ভালো। এইরকম পরিবেশ বজায় রাখতে পারলে ক্রনিক স্কিজোফ্রেনিকদের সম্পর্কে এক বিরাট দুশ্চিন্তা আমরা দূর করতে পারবো।

মানসিক রোগীদের ঠিকমত সুযোগ করে দিতে পারলে অল্প আয়াসেই তাদের রোগ সেরে যায় এবং পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে তারা আবার তাদের কাজের জায়গায় ফিরে যেতে পারেন। এই ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী।

প্রচলিত রোগের যে শ্রেণীবিভাগ আছে আন্তর্জাতিক (ICD—9) ও আমেরিকার (DSM-III) তার সাথে আমাদের অমিল আছে। এবং আমাদের একটি প্রয়োজনীয় শ্রেণীবিভাগ গড়ে তোলা উচিত ; তার ফলে চিকিৎসা ও পরবর্তী পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও আমাদের সুবিধা হবে।

এখনও মানসিক রোগ সম্পর্কে মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা আছে গ্রামের সমাজজীবনে। তার ফলে প্রচুর অপচয় ঘটছে এবং মধ্যযুগীয় কুসংস্কারও পিছিয়ে পড়া মনোভাব দূর করতে পারলে আমরা প্রভূত উপকৃত হব। এগুলি দূর করার জন্য দরকার ব্যাপক শিক্ষার প্রসার ঘটানো—বিশেষতঃ মহিলাদের মধ্যে। সেই সঙ্গে মানুষকে বিজ্ঞানমুখী করা।

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু, কিশোর ও যুবকের সংখ্যা বেশী। এই নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন যে কেন এই রোগ এত বেশী এবং এর প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাগুলি কি হতে পারে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত সাহায্য পেলে গ্রামের মানুষেরা যথার্থই উপকৃত হবেন। কেননা গ্রামের প্রধান মানসিক রোগ বলতেই এই রোগটিকে চিহ্নিত করা যায়। অথচ এই রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে অনেকক্ষেত্রে সাধারণ কিছু বিধি-নিষেধ আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। অথচ এই বিরাট সংখ্যক মানুষ সুযোগ পেলেই আমাদের গ্রামীণ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় সাহায্য করতে পারেন। সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য খুব একটা অর্থবহুল কোন পরিকল্পনা করতে হবে বলে আমরা মনে করছি না।

যেসব কিছু রোগ যেমন ড্রেজ-নির্ভরতা (Drug Dependence), যৌনবিকার ও অসুস্থতা (Psychosexual Disorder), Classical Psychosomatic Disorder ইত্যাদি আমাদের সমীক্ষায় আমরা একেবারেই পাই নি। অথচ ঐ রোগগুলি শহরের জীবনে হামেশাই পাওয়া যায়।

সুতরাং এই রোগগুলি যে সভ্যতার অগ্রগতির আবর্জনা ও অভিশাপ এই ধারণাই আমাদের দৃঢ় হচ্ছে।

এক বিরাট সংখ্যক মানুষ সোসাটাইজেশনের শিকার হচ্ছেন। এর কারণ সম্পর্কে এইটুকু আমরা বলতে পারি যে অপুষ্টি ও অশিক্ষা এর দুই প্রধান স্তম্ভ। সুতরাং যা ও শিশুদের যথা সাধ্যমিকভাবে অপুষ্টি দূর করতে পারলে এবং শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে পারলে এই বিরাট সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন. হাসপাতালের বহির্বিভাগের ভীড় কমবে (চিকিৎসকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন), স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে শুধুমাত্র ওষুধ পাওয়ার জন্য গ্রামের লোক ভীড় করবেন না—এক কথায় সকলেই উপকৃত হবেন। সুতরাং যেখানে বিরাট সংখ্যক মানুষের স্বার্থ জড়িত সেখানে জরুরী ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

যে কথাটি বলে আপাততঃ ছেদ টানছি তা হল পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে রোগ হওয়ার সরাসরি সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাই নি। কারণ যে সমাজ নিয়ে আমরা কাজ করছি তাতে প্রায় সকলেই গরীব শ্রেণীর। যে কটি অবস্থাপন্ন পরিবার আছে তাদের ঘরেও সমান অনুপাতে মানসিক রোগ আছে। সুতরাং চিকিৎসায় ও পুষ্টিতে অবহেলা ছাড়া খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার আর কোন প্রভাব আমরা মানসিক রোগের ওপর দেখিনি। অথচ আমাদের সাধারণ একটি ধারণা আছে যে অন্যান্য রোগের মত মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যতম কারণ। যাইহোক, এই সমীক্ষা থেকে ঐ ধারণাটিকে দৃঢ় করার সুযোগ আমরা পেলাম না।

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্ত)

মানবমনের গ্রাহক হোন—

মানবমনের সমস্ত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের অনুরোধ অন্তত একজন 'মানবমন'-এর গ্রাহক করে পত্রিকাটিকে বাঁচান।

প্রথা বনাম শাস্ত্র, যুক্তি, আইন ইত্যাদি

প্রসেনজিৎ চৌধুরী

প্রস্তাবনা

সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও বিরোধ থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় সপ্রশংস অবস্থান লাভ করেছে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তথ্যনিষ্ঠ ও তত্ত্বসমৃদ্ধ কিছু আলোচনা হয়েছে যদিও, সংস্কারকরা কি পদ্ধতির সাহায্যে প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন সেই সম্পর্কে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা বোধহয় বেশি হয় নি। অথচ এই কথা অনস্বীকার্য যে সংস্কার আন্দোলনের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা শুধু চিত্তাকর্ষকই নয়, গুরুত্বপূর্ণও। গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে পদ্ধতির সঙ্গে সংস্কারকের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত; তাছাড়া, আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার সঙ্গেও সংস্কারকের পদ্ধতি যুক্ত। মহারাষ্ট্রীয় মধ্যশ্রেণীর অগ্রগণ্য সংস্কারক মহাদেও গোবিন্দ রানাডের লেখায় আমরা সংস্কারকের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কথা পাই। (দ্র. P. J. Jagirdar, Mahadeo Govind Ranade, New Delhi, 1971, p. 183-184) তাঁর মতে, সমাজে সংস্কার আন্দোলনের পদ্ধতি চার প্রকার। যথা:

১. প্রথম পদ্ধতিটি পরম্পরা-নির্ভর পদ্ধতি। প্রাচীন শাস্ত্রের নব্য-ব্যাখ্যার সাহায্যে সংস্কারক তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে চান।

২. ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ভাল-খারাপ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের মনে কতগুলো ধারণা থাকে। এই ধারণাগুলোর প্রতি—মানুষের বিবেকের প্রতি—আহ্বান জানানোটা সংস্কারের দ্বিতীয় পদ্ধতি।

৩. তৃতীয় পদ্ধতি আইন বা সংস্কারমূলক নিয়মের দ্বারা সংস্কারের চেষ্টা। কখনো এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয় রাষ্ট্র, আবার কখনো জাত-সংগঠন (caste organisation)।

৪. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কারকরা সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন একটি গোষ্ঠীর জন্ম দেয়। এই পদ্ধতি বিদ্রোহমূলক।

লক্ষণীয়, রানাডে উল্লেখিত প্রতিটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি বিশেষ একটি সংস্কার শাস্ত্রসম্মত বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেও যুক্তি-তর্কের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী। কেননা, একটি শাস্ত্রের মতে যে লোকাচার বা প্রথাটি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, অন্য একটি শাস্ত্রের মতে তা শাস্ত্রসম্মতও হতে পারে। তাছাড়া, একই শাস্ত্রের একাধিক ব্যাখ্যা থাকে। সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত বিতর্ক রচনায় এই ধরনের শাস্ত্রাশ্রয়ী বিতর্কের অনেক নমুনা পাওয়া যায়। আবার, আপাতদৃষ্টিতে সহজ বলে মনে হলেও আইনের দ্বারা প্রথাপুষ্ট সমাজের সংস্কার সাধনও

সহজসাধ্য নয়। এই ধরণের আইন নির্ভর সংস্কার প্রচেষ্টার ফলেও প্রচুর তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ কথায় যারাতে উক্ত পদ্ধতিগুলি কোনোটিই বিতর্ক-বিমুক্ত নয়।

তবে সাধারণতঃ সংস্কার-কেন্দ্রিক বিতর্ক-রচনার যে ধরণের যুক্তির সাক্ষাৎ মেলে তার সবগুলোই তথাকথিতভাবে সমপোক্ষীয় বলে ভাবলে কিন্তু ভুল করা হবে। আসলে অনেক সংস্কারকের 'যুক্তি' শুধু শিথিলার্থেই যুক্তি; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলে সেগুলো অযুক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে। যুক্তির এই শিথিল সংজ্ঞার জন্যই সংস্কারমূলক বিতর্ক-রচনায় বেপ্রকার যুক্তির বিচিত্র ও বিস্ময়কর সমাবেশ দেখা যায়। সংস্কারকদের যুক্তির প্রধান ধারাসমূহ এই প্রকার:

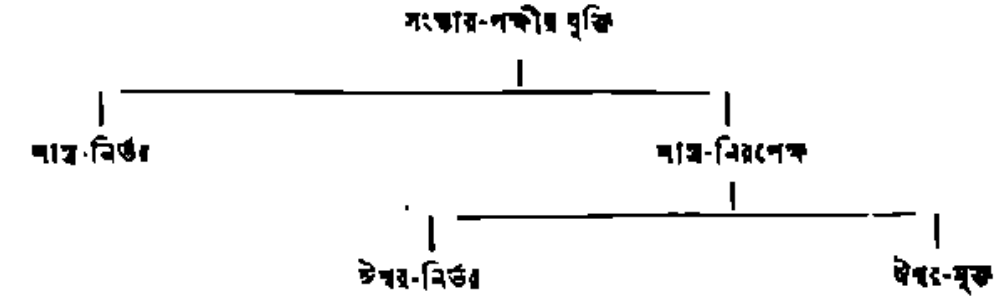

উল্লেখিত বিভিন্নপ্রকার যুক্তির বৈচিত্র্যপূর্ণ ধাঁচ সংস্কার কেন্দ্রিক বিতর্ক-রচনার বিশ্লেষণ। অবশ্য শাস্ত্র-নিরপেক্ষ ঈশ্বর-মুক্ত যুক্তির ধারাটি সংস্কার-সাহিত্যে খুবই দুর্বল। বলা বাহুল্য যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সংস্কারকের যুক্তি-তর্কে একাধিক যুক্তি-ধারার সমাবেশ দেখা যায়। বহুক্ষেত্রে এই যুক্তি-বৈচিত্র্য আসলে সমাজ-বাস্তবের জটিলতাকেই প্রতিফলিত করে। হয়ত ক্ষেত্র বিশেষে এই বৈচিত্র্য সংস্কারকের চেতনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেয়। বর্তমান নিবন্ধে আমরা নির্বাচিত কিছু বিতর্ক-রচনার ভিত্তিতে উনিশ শতকের সংস্কারকদের পদ্ধতির স্বরূপ এবং আনুষঙ্গিক সমস্যার চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করব। আমরা আশা করছি, এই দুর্বল ও অসম্পূর্ণ প্রয়াস থেকে সংস্কার সংক্রান্ত বিতর্কের যুক্তি-বৈচিত্র্য, স্ববিরোধ, সীমাবদ্ধতা ও শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আপেক্ষিকভাবে কিছু পরিষ্কার হবে।

প্রথা বনাম শাস্ত্র

নৃশংস বিধবাদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের সংস্কার প্রচেষ্টা এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। ১৮১৮ সালে রামমোহন প্রকাশ করেন তাঁর সহমরণ-বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা। ১৮১৯ সালে—রক্ষণশীল গোষ্ঠীর যুক্তি-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে—প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকা। এই পুস্তিকা দুটি ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে রামমোহনের সংস্কারমূলক যুক্তি-তর্কের প্রধান পদ্ধতি শাস্ত্র-নির্ভর যুক্তি। শাস্ত্রবাক্যের শুদ্ধ ব্যাখ্যা ও একনিষ্ঠ অনুধাবন সমাজকে কুপ্রথামুক্ত করার সঠিক উপায়—এই ধরণের এক বদ্ধমূল ধারণা রামমোহনের মনে ছিল বলে সহজে অনুমেয়।

এই শাস্ত্র-নির্ভরতা কিন্তু রামমোহনের যৌক্তিক জীবনের আদিপর্বে অনুপস্থিত। ঈশ্বর এক এবং

অদ্বিতীয়—একেশ্বরবাদীর এই বিশ্বাস রামমোহন শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮০৩-৪ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থে। যুক্তি এবং সাধারণ সুবের মানদণ্ড ব্যবহার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে 'falsehood is common to all religions without distinction' (S. Sarkar, A Critique of Colonial India, Calcutta, 1985, p. 3)। পরবর্তীকালে অবশ্য মতামতের এই তীব্রতা ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল। ১৮১৫ সালে তিনি লিখলেন : 'শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা নির্ধারিত পথ আমাদের অনুসরণ করা উচিত এবং এ পথেই আমরা ইহলোকে ও পরলোকে পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিব' (প্রবীণ রায়, রামমোহন রায় : এক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ১০)। আট বছর পর কেনোপনিষদের (১৮২৩) ভূমিকায় বিতর্ক যুক্তিবাদের প্রতি রামমোহন তাঁর স্নেহবাচক মনোভাব স্বার্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন (S. Sarkar, op. cit., p. 6)।

সহজেই অনুমান করা যায় যে দুর্বুদ্ধি ও কুআচারের বিরোধিতা করার সময় রামমোহনের প্রধান অবলম্বন ছিল শাস্ত্রবাক্য। তাঁর মতে, সহমরণ সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রথা। এই বক্তব্য শাস্ত্র-সম্মত প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রামমোহন যে চেষ্টা চালিয়েছেন তাতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও যুক্তি-বিন্যাসের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর শ্লোক-সজ্জিত আক্রমণ প্রতিহত করতে রামমোহন মনুসংহিতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন :

Here, Manu directs that after the death of her husband, the widow should pass her whole life as an ascetic. Therefore the laws given by Angira and others whom you have quoted, being contrary to the law of Manu, cannot be accepted. (Selected Works of Raja Rammohun Roy, Delhi, 1977, p. 125)।

অর্থাৎ, আত্মদাহ নয়, ব্রহ্মচর্যই বিধবাদের একমাত্র শাস্ত্র-সম্মত আচার। কিন্তু মনুর বচন যে মান্য তার কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি? উদ্ধৃতির সাহায্যে রামমোহন প্রমাণ করেছেন যে বেদের বচনানুযায়ী মনুই একমাত্র মান্য প্রমাণ (Ibid.)। শাস্ত্রের সাহায্যে রামমোহন আরো প্রমাণ করেছেন যে স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় আত্মনিগ্রহ করা কখনো শাস্ত্র সম্মত হতে পারে না—কেননা, কামনামূলক আত্মহনন শাস্ত্রবিরুদ্ধ (Ibid, p. 135)।

রামমোহনের সহমরণ-বিরোধী রচনায় শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত বললে অবশ্য ভুল বলা হবে। রামমোহনের যুক্তি-তর্ক শাস্ত্র-প্রধান মাত্র, শাস্ত্র-সর্বস্ব নয়। আসলে আধুনিক কোনো সংস্কারকেরই যুক্তি-তর্ক বোধহয় শাস্ত্র-সর্বস্ব হতে পারে না, কেননা ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবিক আবেদন সংস্কারমূলক লেখায় থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সংস্কারকের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ছাড়াও নব্য-শিক্ষিতদের মানব-দরদী অংশটিকে সংস্কারের প্রতি আকর্ষিত করতেও এই প্রকার আবেদনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। রামমোহনের সহমরণ-বিরোধী রচনার দুই-এক স্থানে মানবিক আবেদনের আভাস বিদ্যমান। এক স্থানে রামমোহন ঈশ্বর-ভয় আর শাস্ত্র-ভয়ের সঙ্গে 'the fear of conscience'-এর কথা বলেছেন (Ibid, p. 130), দ্বিতীয় পুস্তিকার শেষে তিনি মানবিক 'compassion'-এর উল্লেখ করেছেন (Ibid, p. 157), অন্য এক স্থানে—অবশ্য কেবল একটি স্থানেই—তিনি 'reason'-এর

ভিত্তিতে সহমরণকে 'sinful act' বলে ঘোষণা করেছেন (Ibid, p. 130)। এই 'reason' সম্ভবতঃ শাস্ত্র-যুক্ত যুক্তি। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, অন্ধ বিশ্বাস ও লোকাচারের সমালোচনার সময় রামমোহন অধিক যুক্তিশীলতার পরিচয় দিতে পেরেছেন (Ibid, pp. 130 & 148)।

রামমোহনের পর আমরা প্রসিদ্ধ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে পারি। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করতে বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ শাস্ত্র-নির্ভর যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। রামমোহন যেভাবে শাস্ত্রীয় বচনের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে মনুই একমাত্র মান্য প্রমাণ, ঠিক সেইভাবে বিদ্যাসাগরও তাঁর পুস্তিকায় প্রমাণ করেছেন যে পরাশর সংহিতা আসলে 'কলি যুগের ধর্মশাস্ত্র' [অব্রুকুমার সিকদার/দেবেশ রায় (সম্পাদিত), বিদ্যাসাগর : নির্বাচিত রচনা : সাহিত্য ও সমাজ, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৪৫ ('সমাজ' শীর্ষক বিভাগ)]। তারপর পরাশর সংহিতার একটি শ্লোকের ভিত্তিতে তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রমাণ করেছেন যে, যেহেতু 'কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহ যাত্রা নির্বাহ বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে' সেইজন্য 'লোক হিতৈষী ভগবান পরাশর সর্বপ্রথম [বিধবাদিগের পক্ষে] বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন' (ঐ, পৃঃ ৪৬)।

রামমোহনের শাস্ত্র-নির্ভরতার সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব : ধর্ম-সংস্কার ও ধর্ম-তত্ত্বের সংগে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন মূলতঃ একজন সমাজ-সংস্কারক—ধর্ম ও ধর্ম-তত্ত্ব থেকে নিরাপদজনক দূরত্বে তাঁর অবস্থান। তাহলে কেন বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় বৈধতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন? এই প্রসংগে বিদ্যাসাগরের নিজের ব্যাখ্যা উল্লেখ্য :

> যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে [বিধবা বিবাহকে] কর্তব্যাকর্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যাকর্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্যাকর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারে (ঐ, পৃঃ ৪২)।

উদ্ধৃত কথাগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক বিতর্কের পদ্ধতি পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল শাস্ত্র-শাসিত সমাজের পশ্চাৎপদ অবস্থার দ্বারা। তবে এই প্রসংগে মনে রাখা উচিত হবে যে তাঁর সমসাময়িক দুই-একজন সংস্কারক শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তির সাহায্যে বিধবা বিবাহের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁর সংস্কারমূলক লেখার কোনো কোনো স্থানে শাস্ত্রাচারের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয়। এই শাস্ত্র-নির্ভরতা নিঃসন্দেহে অনুসন্ধের বিষয়।

মানবিক আবেদন ও শাস্ত্র-যুক্ত যুক্তি বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক লেখায় অবশ্য পূর্ণতা পায়। তাঁর শাণিত যুক্তির একমাত্র লক্ষ্য লোকাচার। লক্ষণীয়, রামমোহনের সংগে এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কিছু পার্থক্য আছে। লোকাচারের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে রামমোহনের লেখায় কোনো ইংগিত নেই।

বিদ্যাসাগর কিন্তু লিখেছেন : 'আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে।' (ঐ, পৃঃ ৫০) বলা বাহুল্য ; এই উক্তি বিদ্যাসাগরের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বল নিদর্শন। দেশাচার-পন্থীদের নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর দেশাচারের পরিবর্তনশীল স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগরের সংস্কার-চিন্তার বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা উচিত হবে। বিধবা বিবাহের সপক্ষে বলার সময় বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন বৈধব্য যন্ত্রণাক্লান্ত বিধবাদের ব্যাভিচার ও ভ্রূণহত্যার ওপর (দ্র. ঐ, পৃঃ ৪৭)। অর্থাৎ নৈতিক দূষণ থেকে সমাজ রক্ষার্থে বিধবা বিবাহের প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের এই যুক্তিতে সদিচ্ছা যতই না থাকুক, যুক্তিবাদী মানবতাবাদ কিন্তু নেই : প্রথাপুষ্ট সমাজের বৈষম্যমূলক নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে বিদ্যাসাগর যেন বিশেষ চিন্তিত নন। অথচ 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সংস্কারক গোষ্ঠী এবং বিদ্যাসাগরের সহকর্মী ও সহযোগী অক্ষয় কুমার দত্ত চিরবৈধব্যের সমস্যাটিকে বিচার করেছিলেন যুক্তিবাদী মানবতাবাদের মানদণ্ড দিয়ে। (দ্র. A. Sen, Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones, Calcutta, 1977, p. 55) প্রসংগতঃ আমরা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুস্পষ্ট মত উদ্ধৃত করতে পারি : 'I yield to none in advocating widow remarriage, but I advocate it on the broad ground of individual liberty of choice and not on account of immorality, possible or contigent.' (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩১৬, পৃঃ ২৬৪)। এই উক্তির মধ্যে যেন নিহিত আছে সমাজকে ব্যাভিচার-বিমুক্ত করার বিদ্যাসাগরীয় যুক্তির নির্মম সমালোচনা।

আলোচনার বর্তমান স্তরে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি : সংস্কারকরা কেন সাধারণতঃ শাস্ত্রাশ্রয়ী যুক্তিকেই প্রধান এবং প্রাথমিক সংস্কার-পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার বা গ্রহণ করেছিলেন? শাস্ত্রনির্ভরতার কারণ হিসেবে আমরা কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে পারি? যথা :

এক। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ-প্রক্রিয়া দুর্বল ও সীমিত হওয়াই স্বাভাবিক। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেতনায় বহু প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল—আধুনিক প্রযুক্তির সংগে সহ-অবস্থান করেছিল পুরনো, মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা। এই প্রকার সামাজিক অবস্থায় একাংশ সংস্কারক শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য বা আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করাটা খুবই স্বাভাবিক।

দুই। সংস্কারকরা ভেবেছিলেন, সমাজের ভেতর থেকে আঘাত করে সংস্কার সাধন করার পদ্ধতিটি অধিক নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। এই বিশ্বাসের প্রায় অনিবার্য পরিণতি শাস্ত্র-নির্ভরতা। তাছাড়া, কিছু সংস্কারক সমাজের ব্যাপক অংশের সাহায্য-সমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্যেও নিছক কৌশল হিসেবে শাস্ত্রাশ্রয়ী যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রক্ষণশীল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গোষ্ঠীর যুক্তি-খণ্ডনের জন্যও সংস্কারকরা বহুক্ষেত্রে শাস্ত্রবাক্য ব্যবহার করেছিলেন।

তিন। সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে স্বার্থ-সচেতন বৃটিশ-প্রশাসন খুবই সতর্ক ছিল। শাস্ত্র-সমর্থিত নয়, এমন সংস্কারের ঝুঁকি নিতে চাইত না বৃটিশ সরকার। এই প্রশাসনিক সতর্কতার জন্য সংস্কারকরা

বহুক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সমর্থনের সাহায্যে তাঁদের সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধ চরিত্র সরকারকে বোঝাতে চাইতেন।

চার্লস ব্রবসোপাল মিত্র বলেছিলেন : 'There was all the truth which we require in the Hindu Scriptures and we need not therefore borrow anything from other scriptures' (D. Kopf, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton, 1979, p. 136)। ঐতিহ্য-গৌরবের এই ভাবধারা এতাংশ শিক্ষিত হিন্দুর চেতনাকে জুড়ে আচ্ছন্ন করেছিল এবং এর ফলে বহু সংস্কারক শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে খুঁজেছিলেন আধুনিক সংস্কারের সমর্থন।

শাস্ত্র-নির্ভরতার সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে আলোচনা করার পর আমার এই বিতর্ক-পদ্ধতির তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী পরিণতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা উচিত হবে :

ক ॥ সহজেই অনুমেয়, সংস্কারকদের শাস্ত্র-নির্ভর যুক্তি-তর্কের ফলে বিরাট সমাজের চেতনায় শাস্ত্রমুক্ত আধুনিক যুক্তিবাদ বিকশিত হওয়ার সুযোগ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। হয়ত এই শাস্ত্র-নির্ভরতা হিন্দু পুনরোত্থানপন্থীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল।

খ ॥ সংস্কার-কেন্দ্রিক বিতর্ক শাস্ত্রভিত্তিক হওয়ার ফলে তার গণ্ডী হয়ে পড়েছিল সংকীর্ণ : আলোচনা-সমালোচনা শুধু সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধজনের মধ্যেই সীমিত ছিল।

গ ॥ বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন আচারকে বৈধ বলা হয়েছে। এর ফলে শাস্ত্র-নির্দেশনা সম্পর্কে সংস্কারকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই মতভেদ কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল।

ঘ ॥ সংস্কারকরা যে সব শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধার করে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন সে সব ধর্ম-শাস্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রাচীন নীতি শাস্ত্র নয়। এর ফলে সংস্কারকদের চিন্তা-চর্চা এবং কর্মের পরিধি কিছু সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ, 'সমাজ' বলতে তাঁরা সাধারণত উচ্চ বর্ণ হিন্দু সমাজের কথাই বোঝাতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উনিশ শতকের সংস্কারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শাস্ত্রাশ্রয়ী যুক্তি-তর্কের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে ঈশ্বরেচ্ছার কথা বললেও এঁরা শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে সংস্কার-কেন্দ্রিক বিতর্ককে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক রাধাকান্তদেব হালদারের স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি :

> হে স্বদেশীয় লোকসকল ! ...কত কাল আর অজ্ঞান কূপে পড়িয়া শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া চিৎকার করিবে। আপনাদের চক্ষু-কর্ণকে ব্যবহার করা; যুক্তিশাস্ত্রের আদেশানুযায়ী কর্ম কর। ...লিখিত শাস্ত্র বহুলকৃত, এবং তাহা ভ্রম, প্রমাদ ও বিরোধ পরিপূর্ণ। লিখিত শাস্ত্র তোমার-দিগকে সুখ দিবে, তাহার কোনো প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ প্রমাণ নাই ; কেবল ভাবী সুখের গল্প শুনিয়া উপস্থিত নির্দোষ সুখকে কি পরিত্যাগ করা উচিত ? (বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী

সমাজ, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃঃ ৫৪১)

সত্য-অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে 'প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ প্রমাণ'-এর কথা বলা রাধাকান্তদেবের শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তির সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। এক অর্থে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রাশ্রয়ী যুক্তির তুলনায় রাধাকান্তদেবের যুক্তি উন্নত ও আধুনিক। সংস্কার-কেন্দ্রিক বিতর্কের এই উন্নত ও আধুনিক ধারা সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধের পরবর্তী অংশে কিঞ্চিৎ আভাস দিতে আমরা চেষ্টা করব।

শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি প্রসঙ্গ

এক অর্থে, মানুষের 'secular dignity'-কে স্বীকৃতি দেওয়াই যুক্তিবাদের মূলকথা। মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য—মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা ও আলোচনায় ধর্ম শাস্ত্রে প্রাচীন বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে মানুষকে স্থান দেওয়াই আসলে আধুনিক চিন্তা-চর্চার লক্ষণ। জনৈক লেখকের ভাষায় মানবতাবাদের মধ্যেই যুক্তিবাদের পূর্ণতা-প্রাপ্তি: ···'rationalism, to fulfil itself, must culminate in Humanism' (N. Dhar, Vedanta and Bengal Renaissance, Calcutta, 1979, p. 72) এই যুক্তিভিত্তিক মানবতাবাদের প্রভাব ও প্রেরণা উনিশ শতকের সংস্কার-কেন্দ্রিক সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে এই ধারাটি ছিল এক সবল ও সম্ভাবনাময় হাতিয়ার। বলা বাহুল্য, বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে এই যুক্তিবাদ বিকশিত হওয়ার বিষয়গত সুযোগ-সুবিধে এবং বিষয়ীগত প্রেরণা ছিল খুবই নিরুৎসাহজনক।

রামমোহনের সহমরণ-বিরোধী রচনার মূল পদ্ধতি শাস্ত্র-নির্ভর। তবে এই পদ্ধতির সাহায্য ছাড়াই সহমরণের বিরোধিতা করার দুই-এক দৃষ্টান্ত আমরা পাই। ১৮২৭ সালের এই মে'র 'সমাচার দর্পণ'-এ জনৈক পাঠক একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন, '···শাস্ত্রের ভাল মন্দ পরমেশ্বর জানেন আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্মে প্রবৃত্ত হওন কিম্বা করান বিশিষ্ট লোকের অনুচিত।' [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সংকলিত ও সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃঃ ২৫৫] সন্দেহ নেই, লেখকের আবেদনের উৎস মানবিক বেদনাবোধ; সহমরণের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ক বিতর্ক সম্পর্কে তাঁর অনীহা স্পষ্ট।

বিধবাবিবাহের সপক্ষে যাঁরা বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের একাংশের মধ্যে শাস্ত্র-মুক্ত যুক্তিবাদের আধুনিক ধারাটি বেশ স্পষ্ট। ১৮৩০ সালে 'Reformer' পত্রিকায় একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। নারী-দরদী এই পত্র-লেখক লিখেছিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হওয়ার ফলে হিন্দু বিধবার জীবন দুঃসহ হয়ে পড়ে: '...She must then drag on a continual life of misery no better than death itself, because a widow is prohibited in Hindoo Sastras to marry a second husband.' (G. Chattopadhya, Bengal Early Nineteenth Century (Selected Documents, Calcutta, 1978, p. 179). লক্ষণীয়, পত্র-লেখক বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় বৈধতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

শাস্ত্র-মুক্ত যুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্তের

ভূমিকার কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। 'নিরপেক্ষ যুক্তিশাস্ত্র'-এর সাহায্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র অক্ষয় কুমার বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। তাঁর এই সম্পাদকীয়টি পড়ে যে কোনো নির্দোষ-নিরপেক্ষ লোক স্বীকার করবেন যে যুক্তি-বিন্যাসের পদ্ধতি ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতার দিক থেকে বহুক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের তুলনায় অক্ষয় কুমার ছিলেন অগ্রণী। প্রথম যুক্তিতেই আমরা দেখতে পাই অক্ষয় কুমারের যুক্তিবাদী বিচার-পদ্ধতির অকৃত্রিম অভিব্যক্তি :

> প্রথমতঃ। স্ত্রী-বিয়োগ হইলে, পুরুষেরা পুনর্বার দার-পরিগ্রহ করিয়া যদি পাপগ্রস্ত না হয়, তবে স্বামীর মৃত্যু হইলে, স্ত্রীরা পুনর্বার অন্য পতির পাণি গ্রহণ করিলে কি নিমিত্ত অধর্ম-দোষে দূষিত হইবে, তাহা কোনোক্রমে নির্দ্ধারণ করা যায় না (বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ১৪৮)।

এই প্রসঙ্গে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর প্যারীচাঁদ মিত্রের 'Marriage of Hindu Widow' শীর্ষক সংস্কারমূলক লেখাটির কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। লেখাটি ছাপা হয়েছিল 'The Calcutta Review'-তে, ১৮৫৫ সালে। শাস্ত্রবাক্য নয়, যুক্তি এবং ন্যায়বোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লেখাটিতে প্যারীচাঁদ যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার তাৎপর্য লক্ষণীয় :

> Which then we ask a better ground to stand upon—the authority of ancient codes which in many parts are at varience with justice, or the authority of the eternal, immutable, unmistakeable principles of natural reason and right, the standard of virtue which the Shasters profess to represent? [A. Roy, (ed.), Society in Dilemma : Nineteenth Century India, Calcutta, 1979. p. 65].

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' শীর্ষক গ্রন্থেও আমরা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তির বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার প্রকাশ দেখি : 'বিধবার বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও উচিত, কেননা যদি তাহা যুক্তির অনুমোদিত হয়' (অজয়েন্দ্র সরকার, উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্করচনা, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ২৮০)। এই উক্তি শাস্ত্র-শাসন থেকে মুক্ত সংস্কার চিন্তার নির্ভেজাল নিদর্শন।

সংস্কারকের শাস্ত্র-মুক্ত যুক্তির পর্যালোচনার বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য উল্লেখ করা সমীচীন হবে। ১৮৪০ সালে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধটি তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক লেখা এবং উল্লেখযোগ্য যে এতে তিনি শাস্ত্র-নির্ভর বিতর্ক-পদ্ধতির আশ্রয় নেন নি। শুধু শাস্ত্র-মুক্ত যুক্তিই নয়, শাস্ত্রশাসন-বিরোধী মনোভাবের অভিব্যক্তিও তাঁর লেখায় স্পষ্ট : তাঁর মতে 'স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত কর্ম মূলতঃ ভ্রমমূলক হয়ে দেশীয় লোক বাল্যবিবাহের প্রচলন করেছেন [দ্র. অজয়কুমার সিকদার / দেবেন রায় (সম্পাদিত) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১]। এই যুক্তি নিঃসন্দেহে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ। দেশাচার ও শাস্ত্রাচার উভয়কে বিদ্যাসাগর আক্রমণ করেছেন।

এর পাঁচ বছর পর বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতে কিন্তু তিনি শুধু বেশাচারকে আক্রমণ করেছেন এবং শাস্ত্র-নির্ভর বিতর্ক-পদ্ধতির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখার সময়ও বিদ্যাসাগর তাঁর শাস্ত্রানুগ বিতর্ক-পদ্ধতি ত্যাগ করেন নি। প্রথম স্তরে—১৮৫০ সালে বাল্যবিবাহ বিরোধী নিবন্ধ লেখার সময়—বিদ্যাসাগরের লেখায় যে শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ দেখি, তার প্রাবল্য ও স্পষ্টতা পরবর্তীকালে বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

এই স্তরই অবশ্য বিদ্যাসাগরের সংস্কার-চিন্তার শেষ স্তর নয়। এর পর আরো একটি স্তরের সন্ধান আমরা পাই। সহবাস-সম্মতি আইন সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করে শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন : I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child wives, without in any way conflicting with any religious usage... (বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃ: ৪৪১)। অর্থাৎ, ধর্মীয় আচার লঙ্ঘন না করে আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগরের এই পশ্চাদ্‌মুখী পরিবর্তনের মধ্যে 'মধ্যবিত্তসুলভ অসংগতি আর স্ববিরোধ'-এর প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন (ঐ পৃ: ৪৪২)।

এক অর্থে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সংস্কার-চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস যেন বিদ্যাসাগরের সংস্কার-চিন্তার বিবর্তনের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। আসলে বিদ্যাসাগরের সংস্কার-চিন্তার তৃতীয় স্তরটি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর স্ববিরোধ ও সীমাবদ্ধতারই অনিবার্য অভিব্যক্তি।

আইন ও সমাজ

ভারতীয় সমাজের শ্রীবৃদ্ধি নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণই ছিল বৃটিশ-শাসনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এই স্বার্থের খাতিরই বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী হিন্দুদের—বিশেষতঃ ক্ষয়িষ্ণু উচ্চবর্ণ সমাজের—আচার ও অন্ধ বিশ্বাসকে আঘাত করতে চাইত না। এই মনোভাবকে ঠিক উদারতা বলা যায় না। আসলে এই নির্লিপ্ততা ছিল স্বার্থচেতনাপ্রসূত সতর্কতা, রাজনৈতিক দূরদর্শীতার অভাবই সহমরণের মতো নিষ্ঠুর প্রথাকেও প্রশাসকরা আইনের দ্বারা বন্ধ করার আপোষহীন ও দৃঢ় প্রচেষ্টা চালান নি। এমন কি, ১৮২৮ সালেও গভর্ণর জেনারেল আইনের সাহায্যে বিধবাবিবাহ বন্ধ করার বিরোধিতা করেছিলেন (দ্র. বিনয়ভূষণ রায়, বাংলায় সতীদাহ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৮৯)। উল্লেখযোগ্য যে সহমরণ-বিরোধী আইন-প্রণয়ন করার আগে ঔপনিবেশিক প্রশাসকসুলভ সতর্কতা নিয়ে বেন্টিঙ্ক সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন (দ্র. ঐ, পৃ: ২০)।

প্রথা উচ্ছেদের এই আইন-নির্ভর পদ্ধতির প্রতি রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল? সহমরণের অশাস্ত্রীয়তার কথা হিন্দু সমাজে প্রচার করে রামমোহন যে পরোক্ষভাবে বেন্টিঙ্ককে সাহায্য করেছিল সেই সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকা ইতিবাচক

ছিল বলে মনে হয় না। আইনের দ্বারা সহমরণ-প্রথা রোধ করলে সরকারের অনিষ্ট হতে পারে বলে বৃটিশের পক্ষে হিতাকাংখী রামমোহন মত প্রকাশ করেছিলেন (ঐ, পৃঃ ২৫)। বলা বাহুল্য, রামমোহনের পরামর্শে কোনো কাজ হলো না। সহমরণ-নিবারক আইন ঘোষিত হল ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। আইন প্রণয়নের প্রাক্-মুহূর্তে আপত্তি জানিয়েছিলেন যদিও আইন ঘোষিত হওয়ার পর সবান্তরে রামমোহন বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানালেন 'with hearts filled with deepest gratitude' (প্রদীপ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০)।

সমাজ সংস্কারের আইন-নির্ভর পদ্ধতির প্রতি বিদ্যাসাগরের সমর্থন ছিল সুস্পষ্ট। তিনি ভেবেছিলেন, সরকারের আইনের জোরে বিধবা বিবাহের কতগুলো অসুবিধে দূর হলে হিন্দু সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবে। সেইজন্য বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় বৈধতা প্রমাণ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই আইন-নির্ভর সংস্কার-প্রচেষ্টা প্রথাপুষ্ট সমাজে তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিদ্যাসাগর-পক্ষেরই জয় হয়েছিল।

১৮৭১ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-বিরোধী বিতর্ক উত্তেককারী প্রথম পুস্তিকায় তাঁর আইন-নির্ভরতা বেশ স্পষ্ট। শাস্ত্রীয় যুক্তি, মানবিক আবেদন, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি ছাড়াও নানাপ্রকার যুক্তির সাহায্যে তিনি এই পুস্তিকায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'রাজশাসন ব্যতিরেকে উহার [বহুবিবাহ] নিবারণের উপায় নাই' [অক্ষয়কুমার সিকদার / দেবেন্দ্র রায় (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৭০]। যাঁরা আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেন তাদের বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর বক্তব্য রেখেছেন তাঁর নিজস্ব তার্কিকসুলভ ভংগীতে।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-বিরোধী প্রথম পুস্তিকায় রাজশাসনের সপক্ষে নানা প্রকার যুক্তির হাজির করানোর কারণ কী? আমরা সম্ভাব্য দুটি কারণের উল্লেখ করতে পারি। প্রথমতঃ সম্ভবের দশকের শুরু থেকে বৃটিশ শাসন ও স্ব-ঐতিহ্য সম্পর্কে একাংশ শিক্ষিতের মনোভাবে কিছু পরিবর্তন এসেছিল এবং এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু সংস্কারক আইন-নির্ভর সংস্কার-পদ্ধতিকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তিকায় এই সমালোচকদের যুক্তি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর নিজের রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য বৃটিশ প্রশাসন সমাজ-সংস্কারের সংগে নিজেকে যুক্ত করার বিপক্ষে ছিল এবং প্রশাসনের এই সতর্কতামূলক অনীহার জন্যই নিছক শাস্ত্রীয় ও শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তিজাল বিস্তার করে বিদ্যাসাগর পরোক্ষভাবে প্রশাসনকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে 'রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইলে, কোন ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না' (ঐ, পৃঃ ১৭)।

বলা বাহুল্য, রাজ শাসনের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের পদ্ধতিকে সকল সংস্কারক সমর্থন করেন নি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর নিজস্ব শাস্ত্র শাসন-মুক্ত বিতর্ক পদ্ধতির সাহায্যে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধের এক স্থানে রাজশাসন সম্পর্কে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন : 'রাজনিয়ম, রাজদণ্ড প্রভৃতি এ কুপদ্ধতি [অর্থাৎ বহুবিবাহ] নিবারণ করিবার অনেকানেক উপায় আছে বটে,

কিন্তু তথাপি নিবারিত হইলে আমাদের দেশের আর কি মহত্ত্ব রহিল এবং দেশস্থ লোকেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইল ?' (বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ১৮২) লক্ষণীয়, রাজশাসনের কার্যকারিতা সম্পর্কে অক্ষয় কুমারের সন্দেহ নেই ; তাঁর আইন-বিরোধিতা আত্মমর্যাদা-উদ্ভূত। প্রসঙ্গতঃ আমরা 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভূমিকার উল্লেখ করতে পারি। বিদ্যাসাগর যখন বহুবিবাহ নিবারণের উদ্যোগে আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব করলেন তখন দ্বারকানাথ তাঁর পত্রিকায় লিখলেন : '--প্রতি পদক্ষেপে যাহাকে [অর্থাৎ, সরকারকে] তাকা সুখের নয়। ...ইংরাজী শিক্ষার বলে আমাদিগের দেশের লোকেরা অনুচীর সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংই সমাজ সংস্কারে সমর্থ হইবেন।' (বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃ: ২২০) আইন-নির্ভর সংস্কার-পদ্ধতির এজাতীয় সমালোচনার আরো দৃষ্টান্ত সংস্কার-কেন্দ্রিক বিতর্ক-রচনায় পাওয়া যায়।

আলোচনার বর্তমান অংশে আমরা দেখেছি, আইন-নির্ভর সংস্কার পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন যত সংস্কারক। এর সঙ্গে অবশ্য সংস্কারবিমুখ রক্ষণশীলদের বিরোধিতার গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে সম্ভব নয়। তাই আইন বিরোধিতার বিভিন্ন সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা উচিত হবে :

এক ॥ বৃটিশ শাসনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রামমোহন সহমরণ নিবারক-আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাজানুগত্যজনিত কারণে আইন বিরোধিতার এমন দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে অনুপস্থিত।

দুই ॥ দ্রুত সংস্কার-পন্থার বিপক্ষে ছিলেন রামমোহন ; কারণ তাঁর মতে 'gradual improvements are most durable' (Selected Works of Raja Rammohan Roy, p. 42)। এই বিশ্বাসও হয়ত রামমোহনের আইন-বিরোধিতায় নেপথ্যে সক্রিয় ছিল। রামমোহনের এই মন্থর পন্থার প্রভাব পরবর্তীকালের কিছু সংস্কারকের চিন্তা-চেতনাকে নিশ্চয় প্রভাবিত করেছিল।

তিন ॥ রাধাকান্ত দেব আর তাঁর সহযোগীরা ছিলেন রক্ষণশীল শিবিরে। বিধর্মী শাসকের হস্তক্ষেপ থেকে দেশাচার ও ধর্মকে রক্ষা করতে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন ; তাঁদের আইন-বিরোধিতা জন্ম নিয়েছিল 'communal pride and vanity' থেকে (A. F. S. Ahmed, Social Ideas and Social change in Bengal : 1818-1835, Calcutta, 1976, P. 146)। কিছু ক্ষেত্রে হয়ত গভীর আত্মবোধে নিহিত ছিল রক্ষণশীল আত্মগৌরবের উৎস।

চার ॥ বহুবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন : 'সুশিক্ষার ফলে উহা [বহুবিবাহ] অবশ্য লুপ্ত হইবে' [যোগেশ চন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ: ৩১৮]। সুশিক্ষার ফলে সমাজ ক্রমে কু-প্রথামুক্ত হবে—এইপ্রকার বিশ্বাস বহু সংস্কারকের ছিল। এই সুশিক্ষা-নির্ভর সংস্কার-পদ্ধতি আইন-বিরোধিতার একটি প্রধান উৎস।

পাঁচ ॥ নবোদ্ভূত আত্মমর্যাদাবোধের জন্যও একাংশ সংস্কারক রাজশাসন-নির্ভর সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে যুক্ত ছিল ক্রমপ্রসারমান জাতীয় চেতনা।

তাছাড়া, শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যপ্রীতিও কিছু ক্ষেত্রে রাজদাসত্ব-বিরোধিতার জন্ম দিয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

উপসংহার

উনিশ শতকের শেষ পাদে সমাজ সংস্কার আন্দোলন এক নতুন বহিঃআক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল। জনৈক গবেষক এই নব্য আক্রমণের আভাস দিয়ে লিখেছেন :

> By the end of the [nineteenth] century the reactionaries and orthodox critics of the social reform movement were overtaken by the revivalists, whose aims were not to oppose advancement but to create changes in Hindu Society—changes as radical as those of the social reformers but based on Indian, not alien ideals. (C. H. Heimsath, Indian Nationalism and Hindu Social Reform, Princeton & Bombay, 1964, p. 321)

সোজা ও স্পষ্ট কথায় : রক্ষণশীল রাধাকান্ত ও তাঁর অনুগামীদের স্থান দখল করলেন আত্মমর্যাদা-সচেতন তিলকের মতো লোক। এই নতুন পরিস্থিতিতে আত্মগৌরব শুধু সোচ্চারই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে উগ্র রূপও নিয়েছিল। শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের প্রতিও আনুগত্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতীত-অভিমানী এই নব্য-সংস্কারকদের বিচারে রাজআইন ছিল পরি-ভাষা ও দাসত্বের নির্লজ্জ প্রতীক। এমন কি, যুক্তিও এঁদের তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে পড়েছিল। লালা লাজপত রায় সেই সব সংস্কারককে তিরস্কার করেছিলেন 'who based their reform on "rationality" instead of "nationality"— (Ibid, pp. 321-22)। সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পাশ্চাত্য যুক্তি, উদারতাবাদ ইত্যাদির দ্বারা অনুপ্রাণিত পুরনো সংস্কারকদের ওপর আত্মমর্যাদা-সচেতন নব্য সংস্কারকদের এই আক্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

নব্য-সংস্কারকদের এই উত্থানের ঐতিহাসিক উৎস কি? সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আদি নানা দিক থেকে আলা প্রেরণা ও প্রভাবের পরিণতি হিসেবে এই উত্থান সম্ভব হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে সম্ভব নয়। আমরা শুধু গুরুত্বপূর্ণ দুই-একটি ঐতিহাসিক কারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করব।

বৃটিশ শাসনের শোষণ, অন্যায়, বঞ্চনা এবং অন্যান্য তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে এদেশে শিক্ষিতের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ধীরে ধীরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। জাতীয় চেতনাসম্পন্ন এই শিক্ষিত গোষ্ঠীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল আত্মমর্যাদাবোধ এবং এই নবোদ্ভূত বোধের তীব্রতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল আত্ম-নির্ভর সংস্কার পদ্ধতি। সহজেই অনুমেয় যে এই নব্য-চেতনাযুক্ত সংস্কারকরা পুরনো সংস্কার-পন্থীদের বৃটিশ-নির্ভর বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ সুনজরে দেখেন নি। (প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।)

তবে শুধু আত্মমর্যাদার জন্যই নয়, আত্ম-গৌরবের জন্যও পুরনো সংস্কার-পদ্ধতিগুলো ধীরে ধীরে

পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। আমরা জানি, উনিশ শতকের শেষ পাদে ভারতের শিক্ষিত সমাজে সাংস্কৃতিক পুনরোত্থানের চেতনার উদ্ভব হয়েছিল। এই চেতনায় যুক্তি-চর্চার স্থান ছিল গৌণ ও গুরুত্বহীন। ঐতিহ্য-প্রীতির দ্বারা প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ এই জাগরণ শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সাধারণতঃ সকল প্রকার উন্নতির সমর্থন ও প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিল। বলা বাহুল্য যে হিন্দু পুনরোত্থানবাদের অংশ বা ফলশ্রুতি হিসেবে আর্য সমাজ আন্দোলনের মতো দুই-একটি সংস্কার-প্রচেষ্টা দেখা গেলেও পুরোনো সংরক্ষণই ছিল এই উত্থানের প্রধান লক্ষ্য। বিপিনচন্দ্র পালের মতে এই উত্থান 'offered an effective check, for a time to our religious and social reform movements,' (B. C. Pal, Beginnigs of Freedom Movement in Modern India, Calcutta, 1959, P. 62)।

এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখেছি যে উনিশ শতকের সংস্কারকরা যুক্তি-নির্ভর বিতর্ক, আইনের সাহায্য বা শাস্ত্রবাক্যের সময়োপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা সমাজকে গলিত-মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টায় সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও অবিরোধ নিশ্চয় ছিল, তবে সেই অজুহাতে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করাও অনুচিত। উনিশ শতকের শেষাংশে আত্মমর্যাদা-বোধ এবং আত্মগৌরব-চেতনার প্রবল প্রবাহের আঘাতে পুরণো সংস্কারকদের অনেক পদ্ধতি ক্রমে দোষমুক্ত বা পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হতে লাগল। এই প্রবাহের আঘাতে—বা প্রবাহে—বহু শিক্ষিত ভারতীয়, এমনকি সংস্কারকও, দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করলেন। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মেসোডিস্ট এপিস্কোপাল কনফারেন্সের সভাপতির অভিভাষণে নগেন্দ্রনাথ সেন সংস্কারের পদ্ধতি সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার তাৎপর্য এই প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য : '...Social reform should be carried on strictly national, that is Aryan and old shastraic lines, among those who aspire to be known as good Hindus' (C. H. Heimsath, op. cit., p. 228)। এক অর্থে, এই উক্তি, আত্মসমর্পণমূলক আপোসের অভিব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে আমরা সংস্কার আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত হবে। আপোস ও আত্মসমর্পণের প্রবণতা পুরণো কিছু সংস্কারকের চিন্তা ও কর্মে যে ছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উৎস-অনুসন্ধান স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধের বিষয়। তবে বর্তমান আলোচনার 'উপসংহার'-এ এইটুকু নিশ্চয় বলা যায় যে সংস্কার আন্দোলনের ক্রমাবক্ষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বহিঃআক্রমণের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথাও মনে রাখা উচিত হবে। এবং তা করলে আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করব : ইতিহাস-মঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখ থেকে পুরণো সংস্কারকদের ক্রমাপসরণ আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাসের নিজস্ব অমোঘ নিয়ম অনুযায়ীই।

স্বপ্ন : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বইটি আমাদের হস্তগত অনেকদিন আগে পৌঁছেছে কিন্তু তার আলোচনার জন্য অনেক সময় অতিবাহিত হল—এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য লেখকের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলা একাডেমীর থেকে কিছু বই আমরা পেয়েছি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার যে সুপরিকল্পিত, দৃঢ়, উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ তারা নিয়েছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। আমাদের আলোচ্য পুস্তকটি সেই হিসাবে এই উদ্যোগের এক সফল প্রয়োগ। যে কোন বই-এর সাধারণ মান যেমন প্রচ্ছদ, বাঁধাই, ছাপা ইত্যাদির বিচারে বইটিতে পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট। তাই সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় ও উপযোগী বই হিসাবে বইটির বহুল প্রচার হবে এই আশা আমরা করছি। কেননা ইদানীং কালে বাংলা পাঠকের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে এবং বিষয়সমৃদ্ধ বই পড়তে তারা সমানভাবে আগ্রহী।

কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে লেখক স্বপ্ন নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। এক্ষেত্রে স্বপ্নকে ব্যাপক অর্থেই তিনি দেখেছেন—মায়া (Illusion), কল্পনা, দিব্যদর্শন (vision) ইত্যাদিতে। স্বভাবতই বই-এর কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে স্বপ্নকে কে কিভাবে দেখেছেন বা দেখেন এই কথা জানাতে গিয়ে। আদিম-কৌম সমাজ থেকে আধুনিক কাল অবধি—সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অধ্যাত্ম, রাজনীতি ও বিজ্ঞানে এর বহুরূপী প্রতিফলিত ধারণাগুলিকে একের পর এক সাজিয়ে দিয়েছেন। অন্তরের মতামত সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত করেও লেখক তার নিজস্ব মতামত রেখেছেন—স্বপ্নের যথার্থ বিজ্ঞানকে অর্থাৎ পাভলভীয় মনোবিদ্যা আশ্রিত মনোবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। এ'ব্যাপারে তার প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না। প্রসঙ্গত কয়েকটি কথা জানাচ্ছি বইটিকে আরো সমৃদ্ধ করার স্বার্থে।

১। বিভিন্ন বিষয়ে স্বপ্নের প্রভাব আলোচনা করার জন্য অল্প পরিসরে এতবেশী তথ্য ও তত্ত্বের আমদানি করা হয়েছে যে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বেন। এগুলিকে যথাযথভাবে সাজানোর দিকে লেখককে মনোযোগ দিতে হবে যাতে পাঠকেরা একটা সাধারণ ধারণা গড়ে তুলতে পারেন।

২। Reflex বা পরাবর্ত সম্পর্কে লেখক ভুল ধারণা পোষণ করেন। পরাবর্ত হল, উত্তেজনার অনৈচ্ছিক সাড়া বা Involuntary Response to Stimuli. বই-এর ৭১ পাতায় লেখক Reflex বলতে গিয়ে খুব সম্ভবত সর্তাধীন পরাবর্তকেই বুঝিয়েছেন।

৩। স্বপ্ন হচ্ছে বিশেষ এক ঘুমের মধ্যে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ। এইকথা মনে রেখে লেখকের সুযোগ ছিল জাগ্রত অবস্থা থেকে সতীর ঘুমন্ত অবস্থায় বিভিন্ন স্তরে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বোঝানোর। তার ফলে চিন্তা, কল্পনা, Illusion, vision, hypnotic state ইত্যাদি বলতে বলতে চিন্তা-থেকে স্বপ্ন

থেকে গভীর ঘুম ইত্যাদিতে চলে যেতে পারতেন। যেমন আমাদের পাঠ্যপুস্তকে এইভাবে ব্যাপার-গুলিকে লক্ষ্যিত করা হয়।

	জাগ্রত	গভীর ঘুম	স্বপ্নঘুম
অনুভূতি ও উপলব্ধি	স্পষ্ট, বাইরের থেকে তৈরী	নিষ্ক্রিয় বা অনুপস্থিত	স্পষ্ট, ভেতর থেকে তৈরী
চিন্তা	যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিশীল	যুক্তিপূর্ণ স্থিতিশীল	যুক্তিহীন ও উদ্ভট
নড়াচড়া	ক্রমাগত ঐচ্ছিক	হঠাৎ হঠাৎ ঐচ্ছিক	আক্ষরিক কিন্তু নিষ্ক্রিয়িত
স্নায়বিক ক্রিয়া	অ্যাসিটাইলকোলিন উঁচু স্তরে	প্রায় তাই	উল্টে যায় আবার জাগ্রত অবস্থার মতনও হয়

স্বপ্ন আমরা ঘুমের এক বিশেষ অবস্থায় দেখি সেজন্য তাকে আমরা স্বপ্নঘুম আখ্যা দিয়েছি। তাই ঘুমের মধ্যে কথা বলা বা অন্যান্য আচরণ করা স্বপ্নের মধ্যে পড়ে না। এজন্য ঘুম ও জাগ্রত অবস্থার দশাগুলি নিয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরী করা প্রয়োজন।

৪। ৮২ পাতায় লেখক বলেছেন EEG (মস্তিষ্কের তড়িৎ-লেখ) প্রায় দশলক্ষ গুণ শক্তিশালী করে কাগজে ফুটিয়ে তোলা হয়। এটি আসলে ৫০ মিলিয়ান গুণ অর্থাৎ ৫ কোটি গুণ শক্তিশালী।

৫। ৪৯ পাতায় স্বপ্ন ঘুম ও মানসিক সঙ্কটের সম্পর্কের ব্যাপারে সঠিক তথ্য উল্লেখিত হয় নি। এটা প্রতিষ্ঠিত ঘটনা যে বিষণ্ণতায় (Depression) স্বপ্নঘুম বেড়ে যায় এবং স্বপ্নঘুম কমানো বিষণ্ণতার অন্যতম চিকিৎসা। অন্যান্য মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক মোটেই সুস্পষ্ট বা প্রতিষ্ঠিত নয়।

৬। ১০১ পাতায় স্বপ্নের জৈব রসায়ন ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে লেখক যা বলেছেন তাকে আরো বিস্তারিত, সুস্পষ্ট করার সুযোগ আছে এবং আবশ্যকতাও আছে। প্রধান প্রধান যে জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলি কাজ করে যেমন—নরঅ্যাড্রিনেক্রিন, সেরোটনিন, অ্যাসিটাইলকোলিন—এদের তারতম্য ঘুম ও স্বপ্নের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাই আমরা আশা করব পরবর্তীকালে লেখক এ'ব্যাপারে মনোযোগী হবেন।

সব মিলিয়ে আন্তরিকভাবে আমরা চাইছি বইটির বহুল প্রচার।

কোথা থেকে কেমন করে এলাম ; মানুষের জন্য বিজ্ঞান ; দাও ফিরে সে অরণ্য : তপন চক্রবর্তী ; মুক্তধারা ও ঢাকা একাডেমী

অধ্যাপক তপন চক্রবর্তীর উল্লিখিত তিনটি বই আমাদের হাতে এসেছে। যদিও সভ্যতাকে প্রথাকে গৌরবান্বিত করা ও ধর্মীয় মৌলবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্রমাগত প্রচেষ্টা চলছে তবু সত্তরের দশকে জনমানসে প্রগতিশীল চিন্তার অন্যতম দিক হল বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ। বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষা-গুলিতে, বিজ্ঞানচেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য বিভিন্ন লেখা আমরা দেখেছি। ঘরোয়ীতি বাংলা ভাষাতে ও বিভিন্ন পত্র, পত্রিকা ও পুস্তকাদির আকারে এই ধরণের সহজ ও প্রয়োজনীয় আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। কারণ একথা সবাই জানেন যে ইউরোপীয় নবজাগরণের মত আমাদের দেশে তেমন কোন রেনেসাঁ হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সংস্কারধর্মী কাজ হয়েছে। তাই দেরীতে হলেও বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটানো অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয় একথা আমাদের শিক্ষাভিমানীর দল বেশ কয়েক বছর ধরে অনুভব করেছেন এটা আশার কথা। যদিও 'জ্ঞানবর্ধন'-এর পক্ষ থেকে বিগত সাতাশ বছর ধরে আমরা বিষয়টি নিয়ে চিৎকার করছি যদিও আমাদের কণ্ঠস্বর বেশীদূর পৌঁছায় নি।

তপনবাবুর বই সমাদৃত হবে সব মহলে এ আশা আমরা রাখি। কারণ বই-এর বিষয় নির্বাচন ও আলোচনার ভঙ্গী বেশ উঁচুমানের। শক্ত কথা সহজভাবে বলতে গেলে যে ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হয় লেখক তা করেছেন। সাধারণভাবে বইগুলি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। শুধুমাত্র দু'একটি বিষয় নিয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমতঃ 'দাও ফিরে সে অরণ্য' বই-এ প্রক্ষোভ অবহিত হয়ে লেখক 'অবিশ্বাসী ইন্দ্রিয়' প্রসঙ্গে বলেছেন মানুষ মনুষ্যতর প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ সে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, হানাহানি করে, অন্যের ভাগ কেড়ে খায় ইত্যাদি। এটা কখনই বিজ্ঞানের কথা নয়। মানুষ এ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব এবং সমাজে তার অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী বৈষম্যের জন্য এই অমানবিক ক্রিয়াকলাপ আমরা দেখতে পাই। তাই বিচারে মানুষকে মনুষ্যতরের অধম বলাটা কখনই লেখকের বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতি সুবিচার নয়।

দ্বিতীয়তঃ 'মানুষের জন্য বিজ্ঞান' বই-এ 'আকুপাংচার ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান' বিষয়টিকে লেখক ঠিকভাবে উপস্থাপিত করেন নি। আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি বলতে লেখক শুধু আকুপাংচার অ্যানালগেসিয়াকেই বুঝিয়েছেন। তা কিন্তু নয়। অ্যানালগেসিয়া, আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতির একটি অংশ। এর মূল আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতিতে যেন কিছু রোগ নিরাময় হয় বলে দাবী করা হয়।

তৃতীয়তঃ 'দাও ফিরে সে অরণ্য' বই-এ বিজ্ঞান সাংবাদিকতা প্রসঙ্গটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। অনেকদিন থেকে আমরা চাইছিলাম এই বিষয়ে কোন নিবন্ধ এবং লেখক এর জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব দাবী করবেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। কলকাতার একটি বহুল প্রচারিত প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী দৈনিকে রক্তচাপ সম্পর্কিত একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটিতে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু উত্তেজনাকর খবরের (Sensational News) আধিক্যে এতে এমন কিছু মন্তব্য করা আছে যে কয়েকজন দুর্বলচিত্তের মানুষ আমাদের কাছে উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে ছুটে এলেন যে তাদেরও রক্তচাপের কিছু গোলমাল হয়েছে এবং তারা বেশীদিন বাঁচবেন না। তারা শিক্ষিত মানুষ তাই তাদের বোঝানোর জন্য আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই খুঁজে দেখাতে হল যে কাগজের মন্তব্যগুলি এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তত্ত্ব নয়—গবেষণাধীন। আপনারা জানেন, রক্তচাপ তীব্রভাবে মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। তাই দায়িত্বপূর্ণ কোন কাগজ থেকে কখনই এমন মন্তব্য করা উচিত নয় যার ফলে কিছু লোক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং কাগজের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য এই পদ্ধতি অহরহ আমাদের সাংবাদিকরা ব্যবহার করেন। কারণ তারা জানেন মানুষ তার শরীর সম্পর্কে খুঁটিনাটি সবকিছু জানতে আগ্রহী এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে মনস্তত্ত্ব জানার বই পড়ে ওঠাও সম্ভব নয়। তাই তপনবাবুর সাথে একমত হয়ে আমরাও বলছি যারা বিজ্ঞান বিষয়ে সাংবাদিকতা করছেন তারা আরও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেবেন অন্তত অশিক্ষিত ও অনুভূতিপ্রবণ পাঠকদের কথা মনে রেখে।

সর্বোপরি আমরা চাইছি তপনবাবুর বই-এর বহুল প্রচার।

তপন মল্লিক

১৯৮৭ সালের কুইতো নীতিসমূহ

আন্তর্জাতিক কোরামের অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বাস করে যে যেহেতু সর্বসম্মতভাবে আন্তর্জাতিক মানের কোন নির্দেশ নেই মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের রক্ষা করার জন্য তাই একগুচ্ছ প্রাথমিক নীতি নির্ধারণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই নীতিগুলি উপস্থিত অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্য মোতাবেক গৃহীত হয়েছে।

ক. মানসিক রোগীরা সর্বদা মানবিক, পেশাদারী ও মর্যাদাপূর্ণ চিকিৎসা পাবেন।

খ. কারোর মানসিক রোগ থাকার কারণে তাকে কখনই বিভেদমূলক দৃষ্টিতে দেখা চলবে না।

গ. হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ভর্তি হওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হবে ও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ঘ. কোন অস্বেচ্ছায় ভর্তি ও দীর্ঘদিন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভর্তির যুক্তিপূর্ণ সময়ের মধ্যে স্বাধীন ট্রাইবুন্যালে সিদ্ধান্তের জন্য নিরপেক্ষ ও অগ্রযাগত তদারকীর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা যতখানি সম্ভব মুক্ত পরিবেশে থাকবেন এবং প্রয়োজনমত তারা যেন অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সেদিকটাও দেখতে হবে।

উপরোক্ত এই নীতিসমূহকে স্মরণে রেখে আমাদের আগামী এপ্রিল-জুন ১৯৮৮, 'মানবমন' সংখ্যা 'রোগীর মানসিক স্বাস্থ্য সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হবে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন

বহু জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের দেশ। আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবার জন্য নানা বিচ্ছেদকামী শক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সুতরাং জাতিগত, ভাষা ও ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধ, আঞ্চলিক সমস্যা এবং বৈষম্য তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিযোগের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এই সকল সমস্যা যাতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন না করে সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. পি. এ.—১০১/৮৮

MANAB MON
Vol. 27, No. 1

Regd. No. 8570/62
Office of the Registrar of Newspapers for India

Price Rs. 5·00
দাম : ৫·০০

'তারই দূরে
শূন্যে ঘুরে
চিল ডুকরে
মাঠের পারে
গরুর গাড়ান—
গোয়াল খানা—
ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা।'—
সত্যেন্দ্রনাথ

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি মোছার নয়
পাখী না থাক
হাত পাখা আছে,
পৌষ পাবন আছে
আছে শিউলি।
আর আছে তাঁর শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

গরুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
৪৮, সিনি অনুরূপ রায় স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০০৭

গরুজ

সম্পাদক : বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশ ১০/১সি মাণিকতলা। স্ট্রীট থেকে কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ১০/১ এ, বিধান সরণী কলিকাতা-৪ থেকে প্রকাশিত।

মানব মন

মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা-পরিচায়ক দ্বৈমাসিক পত্রিকা

SYCORIL (Thioridazine 25 mg. tablets)

PARKIN (Trihexiphenidyl Hcl 2 mg tablets)

PARKIN PLUS (Trifluoperazine 5 mg. and Trihexiphenidyl Hcl 2mg. tablets)

DORMIN-10 (Nitrazepam 10 mg. Capsules)

BENZEPAM (Diazepam 5 mg. tablets)

NEUROCETAM (Piracetam Liquid & Capsules)

MICRO LABS

BANGALORE

২৫শে বৈশাখ

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের যেসকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

—রবীন্দ্রনাথ

(ভারতবর্ষের ইতিহাস : ১৩০৯)

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই. পি. এ. ১০২৯/৮৮

মে-দিবস

'আজ তোমরা আমাদের টুঁটি টিপে ধরছ, কিন্তু আমাদের নীরবতা সেই কণ্ঠস্বরের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এমন দিন আসবে।'

(১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর যে শ্রমিকদের ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁদেরই শেষ কণ্ঠস্বর)

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই. সি. এ ১০৯/৮৮

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয়	৬১	বর্ষ-প্রসঙ্গ
লোকসংবাদ	৭০	
সংহতি ও বিজ্ঞান সংস্কৃতি	৭১	
বিশেষ বিবেদন ও কার্যনির্বাহক সমিতির বক্তব্য	৭৩	
মস্তিষ্ক চালনা	৭৪	
আমাদের পরিবার ও মানসিক স্বাস্থ্য	৭৫	সাক্ষাৎকার
আমরা ব্যর্থ হয়েছি	৮৩	অমা মুখোপাধ্যায়
মনোবিদের জল্পনা	৮৮	
মনোবিদের ডায়েরী	৯৩	
ড্রাগের নেশার কয়েকটি দিক	৯৭	কমল মুখোপাধ্যায়
শোষ্ঠির মানসিক স্বাস্থ্য—আমাদের পরামর্শ	১০৩	বাসুদেব মুখোপাধ্যায়
একুশ শতকের খাদ্য	১১১	ডঃ ভিকটর ডুভেলিয়ান
পৃথিবীর বাইরে সভ্যজগতের সন্ধান	১১৪	
বিজ্ঞান বিচিত্রা	১১৭	
পরিষৎ প্রত্যক্ষ	১২১	অরুণা হালদার
পুস্তক পরিচিতি	১২৫	অরুণা হালদার

PHARMACIA LABORATORIES

P-28, C. I. T. SCHEME, GARIAHAT ROAD (South)
CALCUTTA-700 031

PRESENTS

List of Items :

1. FLUHEX—Trifluoperazine B.P. 5mg. Trihexyphenidyl H.C.L. U.S.P. 2mg.
2. CHLORFLUHEX—Chlorpromazine H. C. L. I. P. 50 mg. Trifluoperazine H.C.L.B.P. 5mg. Trihexyphenidyl H.C.L. U.S.P. 2mg.
3. FLUHEXETTE—Trifluoperazine B.P. 2·5 mg. Trihexyphenidyl H.C.L. U. S. P. 1mg.
4. REPOISE-25—Thioridazine H. C. L. B P. 25 mg.
5. SOPOR-5—Nitrazepam B. P. 5mg.
6. SOPOR-10—Nitrazepam B. P. 10 mg.
7. CPZ-25—Chlorpromazine H. C. L. I. P. 25mg.
8. CPZ-50—Chlorpromazine—H. C. L. I. P. 50 mg.
9. CPZ-100—Chlorpromazine H. C. L. I. P. 100mg.
10. SERAX—Diazepam I. P. 5mg.

নিয়মাবলী

১. 'মানবমন' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রতিবছর জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

২. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫'০০ টাকা। বিশেষ অক্টোবর সংখ্যা ১০'০০ টাকা। সডাক প্রতি সংখ্যা ৬'০০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সডাক ২৫'০০ টাকা অগ্রিম দেয়। জানুয়ারি থেকে বর্ষ আরম্ভ।

৩. চেক কেবলমাত্র কলকাতার জন্য। ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার ইত্যাদি PAVLOV INSTITUTE & HOSPITAL অথবা MANABMON-এর নামে প্রেরণ।

৪. এজেন্সী বা ব্যবসাসংক্রান্ত বর্তাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। কমিশন ২৫%।

৫. অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি খরচ না দিলে গ্রাহকদের কাগজ বুক-পোস্টে পাঠান হয়।

পাভলভ ইনস্টিটিউট
১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

মানবমন-এর

উপদেষ্টামণ্ডলী

ডাঃ নীহার মুন্সী ডাঃ ধরেন্দ্রকুমার পাল ডাঃ সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত শ্রীগোপাল হালদার ডাঃ অজিত দেব ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ডাঃ সন্তোষ দাশ ডাঃ হীরক চন্দ ডাঃ নরেন গঙ্গোপাধ্যায় ডঃ বিনায়ক ভট্টরায় শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় ডঃ গৌরী গাঙ্গুলী ডাঃ বিভু মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)
ডঃ অরুণাদেবী হালদার ডাঃ বেলা দত্তগুপ্তা ডঃ তারকমোহন দাস ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় শংকর চক্রবর্তী বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ডাঃ ইন্দ্র সেনগুপ্ত ডাঃ সুনীল সেনশর্মা।

কার্যকরী সমিতি

সুনীল বিশ্বাস অমল বন্দ্যোপাধ্যায় সবিৎ রায় সৌভিক গোস্বামী প্রবীর বিশ্বাস ডাঃ ইন্দ্র সেনগুপ্ত ডঃ অদিতি চৌধুরী সুমিত মৌলিক তাপসী দাশগুপ্ত প্রবীর মজুমদার উর্মি মৌলিক উত্তী সেনগুপ্ত

এই সংখ্যার মুদ্রণে:, অমল চট্টোপাধ্যায়

মানবমন

এপ্রিল-জুন, ১৯৮৮ বর্ষ ২৭, সংখ্যা ২

সম্পাদকীয়

ধর্ম-প্রসঙ্গ

ধর্ম প্রসঙ্গ আজ পত্র-পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। ধর্মীয় যুদ্ধের সংবাদ দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চিম এশিয়ার মানুষের মন আলোড়িত করছে। সব ধর্মই যেন নতুন করে আত্ম-রক্ষায় সচেষ্ট; অধর্মের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সজাগ সতর্ক। ইজরাইল-প্যালেস্টাইন; ইরাণ-ইরাক-এর মধ্যে যুদ্ধ চলছে। ইহুদীর ইসলাম বিদ্বেষ, খৃষ্টানদের ইহুদী বিদ্বেষ, আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় অতি প্রাচীন ও পরিচিত কাহিনী। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিদ্বেষ বিষবাদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই অস্পষ্ট হলেও সামান্য নয়। স্বধর্মে নিধন শ্রেয় ও পরধর্ম ভয়াবহ—সব ধর্মের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্দীপনা উন্মাদনা জাগাতে—বণহুঙ্কারটি খুবই উপযোগী। সব ধর্মের পুঁথিপুস্তকে স্পষ্টভাবে না থাকলেও পরোক্ষভাবে সব ধর্মগুরুরাই এই ধরণের প্রচারই করে আসছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা থেকে আত্মবিস্তারের প্রচেষ্টা স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। সব ধর্মের মর্মবাণী যদিও প্রেম, দয়া, মায়া, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ মনো-ভাব সঞ্চারের সহায়ক, সব ধর্মই প্রচারের ক্ষেত্রে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা' জাতীয় বাণী ব্যবহার করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নিজের ধর্মের স্বার্থে শুধু বিধর্মী নয়, স্বধর্মীদের মধ্যেও যারা মূলধর্ম থেকে বিচ্যুত বা ভ্রষ্ট—তাদের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করা হয়। মধ্যযুগে ইয়োরোপে এবং বর্তমানে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় আন্তর্ধর্মীয় কলহ ও সংগ্রামের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে সকলেই সুপরিজ্ঞাত। প্রতিবেশিকে ভালবাসবে, পাশের বাড়ীতে কেউ অভাবের দরুণ উপোসী নেই জেনে তবেই নিজের খাদ্য গ্রহণ করবে, সব জীবের মধ্যেই শিব আছেন, তাই সব জীবকে দয়া করবে—এই সব খুব মূল্যবান ও সমাজহিতৈষী বাণী সব ধর্মপুস্তকে লেখা রয়েছে, সব ধর্মগুরুর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে; তবু কিন্তু স্বধর্মে নিধনপ্রয়াসী ও পরধর্ম ভয়াবহ—এই ধারণায় বিশ্বাসী ধার্মিকের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয়। আমাদের দেশে—ধর্মের ভিত্তিতে ত্রিখণ্ডিত দেশে—ধার্মিকের সংখ্যা বেশি হলে বা মৌলবাদীরা মদত পেলে বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হবার কোনো কারণ না থাকতে পারে কিন্তু যখন পত্রপত্রিকার শিরোনামে সমাজতান্ত্রিক দেশে ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সংবাদ পড়ি, তখন বিস্মিত ও চিন্তিত না হয়ে পারি না। মার্কসবাদী বন্ধুরা আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করতে সাহায্য করবেন কি?

এই দিকে মার্কসবাদী বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও তাঁদের বক্তব্য জানানোর জন্যও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

শোকপ্রকাশ

যোগবিয়োগের জীবনের শেষের দিকে বিয়োগপঞ্জীটা ভারী হয়ে ওঠে। শেষ ফল বিয়োগান্তই হয়। প্রকৃতির এ-নিয়ম বদলের ক্ষমতা মানুষের কোনোদিনই হবে না।

এই সংখ্যাতেও দুই শুভানুধ্যায়ীর মৃত্যু সংবাদ জানাতে হচ্ছে এবং আমাদের গভীর শোকের আভাস মাত্র কথা দিয়ে প্রকাশ করতে হচ্ছে।

প্রথমে সর্বজন পরিচিত কল্লোল যুগের শেষ সেনাপতি প্রেমেন মিত্রের কথা বলছি। 'পাঁক' ও 'প্রথমা'র সময় থেকে তাঁকে আমরা জানতাম। আমাদের কলেজ জীবনে 'প্রবাহ' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করতে গিয়ে অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, প্রবোধ, শৈলজার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। প্রেমেন মিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে 'মানবমনে'র আমলে। অনেকেই হয়তো জানেন না যে প্রেমেন ও প্রয়াত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের নাট্যসংস্থার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এক সন্ধ্যায় বিশেষ এক উপলক্ষে দুজনে ভিক্ষার ঝুলি হাতে দর্শকদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রেমেন মিত্রের মৃত্যু পরিণত বয়সে হয়েছে। তবুও আমরা বলবো বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে। বয়সের ভার প্রেমেনের গতিকে শ্লথ করেনি, তাঁর সৃজনীশক্তি নিঃশেষ হয়নি। বিশেষ মিত্র হিসেবে প্রেমেন মিত্রকে আমরা আজীবন মনে রাখবো।

আর পাভলভ ইনস্টিটিউট ও 'মানবমন'-এর সঙ্গে দ্বিতীয় জনের ছিল আরো নিবিড় সম্পর্ক। 'মানবমন' সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন আমাদের এই বন্ধু সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত। বহু বছর ধরে শারীরবিদ্যার এই অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর পাভলভ সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা ছিল। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে এই অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। বহু সভা, সমিতি, সেমিনারে অংশ গ্রহণ করে দর্শকদের অনেক নতুন কথা শোনাতেন। তাঁর বলার ভঙ্গীর বৈশিষ্ট শ্রোতাকে মোহাবিষ্ট করে রাখতো। বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য করে পরিবেশন করা খুব সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে তাঁদের পক্ষে যাঁরা স্কুল কলেজে ইংরিজি মিডিয়ামে শিক্ষা পেয়েছেন ও জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন বিদেশী ভাষায় লেখা বই পড়ে। রোগের মধ্যেও তিনি 'মানবমনে'র পাতায় অনেক দামী জ্ঞানের টুকরো পরিবেশন করেছেন ও অনেক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন যা আমাদের ভাবিয়েছে ও নতুন তথ্য সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ পরিশোধসাধ্য নয়। তাঁর পুত্র ও ভাগ্নের শোকে আমরাও অংশীদার।

সংহতি ও বিজ্ঞান-সংস্কৃতি

মানবমন পত্রিকার পক্ষ থেকে পাঠকদের কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন আমরা তুলে ধরছি। প্রশ্নগুলি চলমান বাস্তবের সংকটের গভীরতা ও ব্যাপ্তিকে ধরবার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে এই সংকট থেকে মুক্ত হবার অনিবার্য সম্ভাবনার ভ্রূণগুলিকে খুঁজে বের করতে। অথবা মানবজাতির সামগ্রিক বিলুপ্তিই অপ্রতিরোধ্য ভবিষ্যৎ কিনা তা খতিয়ে দেখতে। মানবসভ্যতার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মানুষ বারে বারেই নানা ধরণের ছোট বড় সংকট কাটিয়ে উঠে আসতে পেরেছে; যদিও মানবশক্তির প্রায় পুরোটাই অপচয়িত হয়েছে সংখ্যালঘু মানবসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক লোভ, লালসা ও প্রাধান্য বিস্তারের অপচেষ্টার যূপকাষ্ঠে। পাথর ছুঁড়েও মানুষ মারা যায়, আজ তারই পরিবর্তে অস্ত্র নির্মাণের উন্নতিতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মানবশক্তির বিপুল অংশকে কাজে লাগানো হচ্ছে। মানব মস্তিষ্ককে এই অপচেষ্টার প্রভাবাধীন করে রাখার জন্য নূতন নূতন কৌশল আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবুও এই কয়েক হাজার বছরে মানবশক্তির ন্যূনতম অংশ মানবকল্যাণে প্রযুক্ত হয়ে কি বিপুল উন্নতিই না বাস্তবায়িত করেছে ও সম্ভাবনার নূতন নূতন দিক তুলে ধরছে। আমরা বুঝতে চাই কোন্ শক্তি আগামী বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে? মানবহননের না মহাজাগতিক মানবমনের? আপ্তবাক্য নয় আমরা বুঝতে চাই আশাবাদ কি বৈজ্ঞানিক গতিপ্রকৃতিরই ভাষা না যতই অন্ধ হয়ে থাকি না কেন প্রলয় আসন্ন? প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টায় আমরা সব রকমের মতবাদকে সমান গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করবো। তবে 'মানবমনে'র পাঠকদের কাছে নিবেদন, উত্তর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের নাম, বয়স, পেশা, ঠিকানা—এগুলি সংযোজিত করে দেবেন। আশা করব আমাদের এই মিলিত প্রচেষ্টা চারপাশের গতিপ্রকৃতির অতীতের টান, বর্তমানের ভাষা ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বুঝতে আমাদের সহায়তা করবে।

প্রশ্নমালা :

১। সংহতি বলতে কি পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রভাবসক্রিয় বিকাশমান অথবা পশ্চাদগতি স্বাতন্ত্র্যসমূহের সহাবস্থান না এগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকার শেষে বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে ইতিবাচক মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা?

২। ভারতের সংহতি কথাটি কোন্ বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করে?

৩। এই বাস্তব অবস্থা কি বিপন্নতার ইঙ্গিত বহন করছে?

৪। যদি করে তবে—

(ক) ধর্মীয়, আঞ্চলিক, জাতি-উপজাতি ও ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য বাড়ছে না বিলুপ্ত হওয়ার দিকে যাচ্ছে?

(খ) প্রতিটি স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহাসিক ভূমিকা কি নিঃশেষিত ?

(গ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কি এই স্বাতন্ত্র্যেরই প্রশাসনিক পরিকাঠামো ?

(ঘ) অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কি সম্প্রদায়গত উন্নয়নের ফলপ্রসূ পথ বলে বাস্তবে বিবেচিত ?

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল চলমান উন্নয়ন কি মূলতঃ এই স্বাতন্ত্র্যবোধের সহায়ক না বিরোধী ?

(চ) সমস্ত অঞ্চল-সম্প্রদায়কে সমভাবে সম্পদ বিতরণের উপযোগী সম্পদসৃষ্টির মূল প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বাধুনিক উপাদান ও বিশেষ দক্ষতা আমাদের আছে কি ?

(ছ) এই সম্পদ বিতরণ কি বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় করা সম্ভব ?

(জ) এই বিতরণই কি ঐক্যপ্রক্রিয়ার প্রাথমিক শর্ত ?

(ঝ) ধর্ম ও অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতিভিন্নতা কি স্বাতন্ত্র্যবোধের বৃদ্ধির ভাবাদর্শগত হাতিয়ার না সংযুক্তির লক্ষ্যে ধাবমান ? এই স্বাতন্ত্র্যবোধই কি পারস্পরিক বিরোধ ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে ?

(ঞ) এই সংস্কৃতিভিন্নতার অস্তিত্ব, প্রসার ও বৃদ্ধি কি বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বাধুনিক অবদানের ওপর একান্তই নির্ভরশীল ? বাস্তব অবস্থা এ ব্যাপারে কি বলছে ?

(ট) সমাজ-সংস্কৃতি ভিন্নতা কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গতিকে বাড়াচ্ছে না কমাচ্ছে, না এক স্থিতাবস্থার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে ?

(ঠ) সামুদ্রিক, ওজনোস্তর, আনবিক ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ এমন কোন সংকট তৈরী করছে যা সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের সংকটরূপে পরিগণিত ? এ-ক্ষেত্রে হাই-টেকের প্রভাব সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করেন ?

(ড) পরস্পরবিরোধী সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর মধ্যে এই সংকট দূরীকরণে কি সহযোগিতার কোন বাস্তব উদাহরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ?

(ঢ) যদি এ ধরণের উদাহরণসমূহ পাওয়া যায় তবে কি আমাদের ভাবতে হবে দুই পরস্পর-বিরোধী সামাজিক কাঠামোর লড়াই তাদের লক্ষ্য হারিয়েছে, না কৌশলের নূতন নূতন চেহারা হাজির করছে ?

(ণ) সামগ্রিক পরিস্থিতি কি কোন বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে অথবা সার্বিক ধ্বংসের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলেছে ?

বিশেষ নিবেদন

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের নিজেদের অনেক ছোটবড় সমস্যা নিয়ে আমরা সাধ্যানুযায়ী আলোচনা করেছি, সভা ডেকেছি, আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছি। শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি বর্তমানে সব দেশের সব সমস্যাই বোধ-হয় পরস্পর সম্পৃক্ত ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই মনে হয়, যতই ছোট আমরা হই না কেন, আমাদের পত্রিকার মানমর্যাদা বা প্রচার সংখ্যা যাই হোক না কেন, বড়দরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমরা যদি চেষ্টা করি, আমরা অহংপীড়িত বলে বিবেচিত হবো না। যে সমস্যাটিকে আমরা এই সংখ্যায় প্রশ্নাকারে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি সেটি সম্পাদকমণ্ডলীর একটি সভায় প্রশ্নগুলি প্রথমে উত্থাপিত হয় ২২।৫।৮৮ তারিখে। প্রশ্নগুলি একটু বেশি জটিল মনে হওয়ার এবং কিছুটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বিবেচিত হওয়ায়, এর মাত্র কয়েকটি সোজা ভাষায় সহজ করে সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠকদের কাছ থেকে সাড়া পাব এই আশাতেই এই বিস্ফোরণীন সমস্যার অবতারণা। যদি প্রশ্নগুলো স্পষ্ট বা সঠিক অর্থবহ বলে মনে না হয়, তাহলে পাঠক কুণ্ঠিত না হয়ে সেই কথাও তাঁরা উত্তরে জানাতে পারেন। তাঁদের সাড়া আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

মোটকথা আমরা পাঠকদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। এ ব্যাপারে তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির বক্তব্য

এবারকার রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে অন্য দুজন শলাকাদলের সঙ্গে 'মানবমন'-র সম্পাদকও আছেন। অন্য দুজনের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা সনাতনী খাতুন, অন্যজন সর্বজনবিদিত ইতিহাস বেত্তা অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়। এবারের পুরস্কার প্রদাতাদের একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়েছে। মনে হচ্ছে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে প্রাপকদের কাজের নতুনত্ব বা অভিনবত্বের জন্য। তিনজনের কাজেই মৌলিকত্ব লক্ষণীয়। 'ধ্বনি থেকে কবিতা' ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন কাজের সূচনা শুধু নয়, কবিতার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে বিজ্ঞানধর্মী গবেষণার সূত্রপাতও বটে। অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন আমাদের এই বহুমন্দিত, বহুনিন্দিত নগরীর ইতিহাস অনুসন্ধানে নতুন পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন ও নতুন তথ্য সংযোজিত করেছেন। আর ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানত পাভলভীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে কৈশোর সমস্যার আলোচনা করেছেন—যা আমাদের দেশের পক্ষে সত্যিই নতুন। এঁদের প্রত্যেককে সম্মান ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাদের আনন্দের বিশেষ কারণ কিন্তু ব্যক্তিগত নয়। এতদিন পরে বোধহয় পাভলভের মস্তিষ্কসঞ্চালিত মনোবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে স্থান পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। ডক্টর ভাস্কর রায়চৌধুরী ও সেনেট সিন্ডিকেটের সভাদের কাছে এই আবেদন জানাবো। আশা করি আবেদন নিষ্ফল হবে না।

মস্তিষ্ক চালান

সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মস্তিষ্ক চালান বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যাকটাড সম্পাদকমণ্ডলীর তথ্য অনুযায়ী ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগত পরদেশীদের ৪০ শতাংশই আসে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে, আর ১৯৭০ সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৫ শতাংশে। উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার কল্যাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষার খরচ বাবদ গড়ে বছরে প্রায় ১৮০ কোটি ডলার বাঁচাতে পেরেছে।

মস্তিষ্ক-চালানের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলির যে ক্ষতি হচ্ছে তার উপাদান হচ্ছে এইগুলি :

—শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে চলে যাওয়া বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যয়। ১৯৭০-এর দশকে এজন্য ক্ষতির পরিমাণ প্রতি উন্নয়নশীল দেশ পিছু বছরে গড়ে ৩২ কোটি ডলারেরও বেশি ;

—অধ্যয়নের শেষে উচ্চশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে ফিরে আসে না তাদের প্রশিক্ষণের জন্য অর্থদান-এরজন্য আরো ৭০ কোটি ডলার ক্ষতি :

—দেশত্যাগী বিশেষজ্ঞ স্বদেশে যে মালপত্র উৎপাদন বা পরিষেবা প্রদান করতে পারতেন তার মূল্য—বছরে ৩০০ কোটি ডলার ;

—স্বদেশে অর্থ প্রেরণে বিধিনিষেধজনিত, ও ই সি ডি দেশসমূহে উন্নয়নশীল দেশের বিশেষজ্ঞদের ওপর বৈষম্যমূলক করের দরুন ক্ষতি-বছরে ১৫০ কোটি ডলার (তথ্য অ্যাকটাড সম্পাদকমণ্ডলীর)।

সংক্ষেপে বললে, মস্তিষ্ক চালানের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বছরে ৮০০ কোটি ডলার (১৯৭৫ সালের দরে)। এই অংকটিতে অবশ্য পরোক্ষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির হিসাব ধরা হয়নি, সে হিসাব করাও যায় না।

চিকিৎসকরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিশেষ ক্ষতি হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী কালপর্বে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি থেকে প্রায় ১৩০,০০০ চিকিৎসক শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে চলে গিয়েছেন। আর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে সংক্রামক ব্যাধিতে মারা গেছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু সমেত আড়াই কোটি মানুষ (পশ্চিমী সূত্র ভিত্তিক এই তথ্য দেওয়া হয়েছে ডাচ বিজ্ঞানী জান টিনবার্গেন রচিত 'আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজা' বইটিতে)। সোভিয়েত সমীক্ষা ৫মে ৮৪

আমাদের পরিবার ও মানসিক স্বাস্থ্য

সাক্ষাৎকার

পরিবারের সংগঠন, পরিবর্তন ও কার্যকলাপের ওপর মানসিক রোগের উৎপত্তি, বিকাশ ও নিরাময় অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই কথা মনে রেখে পাভলভ ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টার, বর্ষীয়ান মনোরোগ-চিকিৎসক ও এই পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাছে আমরা কয়েকজন তরুণ চিকিৎসক একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম, 'মানবমন' এর কথা স্মরণে রেখে। এরই বিশেষ অংশ এখানে প্রকাশ করা হল।

প্রশ্ন ১ঃ মানসিক রোগ তৈরীর ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারগুলির কোন ভূমিকা আছে কি? থাকলে তা কি ধরনের?

উত্তর ঃ তোমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে একটু গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে নিই। সেই আদিম কোম সমাজ থেকে পরিবারের গঠন ও সামাজিক পরিবেশ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। পরিবার যেমনই থাক্ মানসিক রোগ তাকে ছাড়ে নি। কারণ মনের রোগ মানব সভ্যতার জন্মের ইতিহাসের মতই পুরোতন। তাই তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলা যায় যে নিঃসন্দেহে পরিবারের ভূমিকা আছে। শুধু মনের রোগ তৈরীর ক্ষেত্রেই নয়, এর বিকাশ, নিরাময়, পুনর্বাসন—প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা আছে। কারণ ব্যক্তিতো পরিবারকে ছাড়িয়ে নয়। এখানে যেটা উল্লেখ করার মত বিষয় তা হল-আজকে মানসিক রোগকে সম্পর্কিত করে পরিবার নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে, যা আগে হয়নি। এখন মনের স্বাস্থ্যের প্রায় সব আলোচনাতেই পরিবারের কথা আসছে। কেন? কারণ একটাই। বহুস্তর ক্ষেত্রে মানসিক রোগ নিয়ে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করলে পরিবারই থাকবে তার মূখ্য ভূমিকায়। কয়েক শতাব্দী ধরে মানসিক রোগের জন্য ব্যবস্থা ছিল কোন প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মানসিক আরোগ্যশালয়, জেল; অধুনা নার্সিং হোম—যে কোন এক জায়গায় ভর্তি করে দেওয়া। পরিবারের লোকের দায়িত্ব শেষ। মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ করলেই হল। যদি সে সুস্থ হয়ে ওঠে তাহলে পরিবারে ফিরে আসবে ঠিকই কিন্তু সে সম্ভাবনা খুবই কম। সম্ভবত পরিবারের সাথে তার সম্পর্কও আর থাকছে না। অবশ্য সবসময় পরিবারকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, উপদ্রব পীড়িত (disturbed) রোগী হলে সে জিনিসপত্রের ক্ষতি করে, পরিবারের চরম অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তাকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে পরিবারের সহ্যশক্তি থাকে না, শিশুদের ওপর গভীর ছাপ পড়ে, অর্থনৈতিক চাপের ব্যাপারটাও আছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানবদ্ধ জীবনই ছিল পাগলদের মুক্তির একমাত্র উপায়। তারা এইভাবে অবহেলায়, অবহেলায় বেশীদিন বাঁচেও না। কিন্তু ধারনা পাল্টাচ্ছে। পাগলদের প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠান উপচে পড়ছে, ঠাঁই নেই। সুতরাং রাস্তায় যখন তাদের ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না তখন তাকে পরিবারের মধ্যেই রাখতে হবে। আমেরিকার মত ধনী দেশেও প্রতিষ্ঠানে রেখে চিকিৎসা করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এখন পরিবারকে যদি মানসিক রোগের দায়িত্ব নিতে হয় তাহলে পরিবার নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। শুধু তাই নয়, গবেষণায় দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ করে চিকিৎসা করলে যে ফল পাওয়া যায়—প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিবারের মধ্যে থেকে চিকিৎসা করলেও একই ফল পাওয়া যায়। কখনো কখনো ফল অনেক ভালো হয়। তাই আমাদের পরিবারগুলিকে

যদি আমরা মানসিক রোগীদের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে পারি তাহলে অযথা প্রচুর খরচ করে বছরের পর বছর ধরে প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমাদের বহন করতে হবে না। কিন্তু এইভাবে প্রতিষ্ঠানবিমুক্ত করার আর একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ রাখার যে কুফল আছে সেগুলিকে সংশোধন করা। সবাই আশা করেছিলেন যে মানসিক রোগীকে প্রতিষ্ঠান থেকে বার করে পরিবারে ঢোকাতে পারলে রোগী চিকিৎসিত ও পুনর্বাসিত হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফল তা দাঁড়ায়নি। বড় প্রতিষ্ঠান থেকে তারা স্থানান্তরিত হল ছোট প্রতিষ্ঠানে, অর্থাৎ বাড়ীতে। কিন্তু পরিবারগুলিকে উপযুক্ত না করেই আমরা মনোরোগীদের দায়িত্ব তাদের ওপর দিলাম।

যাইহোক তোমাদের দ্বিতীয় অংশটির উত্তরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি। একটি একক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদে চাকরী করেন, তাদের দুটি ছেলেমেয়ে। তারা কাজের লোকের কাছে মানুষ। স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব খুব বেশী নেই—বেশ কয়েকবার তারা ডিভোর্সের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। এই নিয়ে বাড়ীতে অশান্তিও হয়। তবু কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে চলছিল। কয়েকবছর পর দেখা গেল ছেলেটির কিছু অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে। ক্রমশঃ তা বাড়তে বাড়তে উন্মত্ততায় পৌঁছাল। এই ঘটনাটি থেকে আমরা কি প্রমাণ করতে পারি, বাবা—মা,-এর স্নেহ ঠিকমত না পাওয়া এবং পরিবারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া মানসিক রোগ তৈরীর অন্যতম কারণ। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ তা বলা যাবে না, কারণ একই পরিবারে ছেলে, মেয়ে উভয়েই প্রায় একই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র ছেলেটি মনোরোগের শিকার হল মেয়েটি নয়, তাহলে মস্তিষ্কের ধরণের ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে। আবার পরিবার যারা পায়নি এমন অসংখ্য কিশোর যুবকদের আমরা জানি যারা বস্তি বা রাস্তার ফুটপাথের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে অথচ যৌনাচার, চুরি, ছিনতাই, খুন-জখম ইত্যাদিতে অভ্যস্ত অসামাজিক মনোরোগী (Sociopath, psychopath) হয়ে হয় জেল খাটছে নয় মারা যাচ্ছে। এরা পরিবারের স্নেহ, মায়া, মমতা পেলে সবাই হয়তো এমনটি হত না, একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

প্রশ্ন ২। পরিবারের অর্থসামাজিক অবস্থা মানসিক স্বাস্থ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে।

উত্তর। আমি আগেই বলেছি তোমাদের প্রশ্নগুলির প্রথাগত উত্তর দেব না। কারণ এই ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্কের ব্যাপারটি এত জটিল ও সূক্ষ্ম যে 'হ্যাঁ', 'না' ইত্যাদি ধরনের উত্তর হয় না। যে প্রশ্নটি এখন করছো তার উত্তর দিতে গেলে পরিবারের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাপারটি জানতে হবে। তোমরা জানো মনুষ্যপ্রজাতির অস্তিত্বের সঙ্গে দুটি কর্ম নিহিত—আত্মরক্ষা ও প্রজাতিরক্ষা। আত্মরক্ষার ব্যাপারে বলার কিছু নেই কিন্তু প্রজাতিরক্ষার জন্যই পরিবারের উৎপত্তি। কারণ মানবশিশুকে স্বাবলম্বী করতে গেলে পাঁচ, সাতবছর সময় লাগে। এখন এই সময়টুকু তাকে রক্ষা করে তার বিকাশ ঘটাতে গেলে, তাকে পৃথিবীতে আনার জন্য যারা দায়ী তাদের একত্রে একক সংগঠন করে থাকতে হবে। আবার অন্যদিকে দম্পতির যে একক সংগঠন হল তার গৃহস্থালী বিষয়সামগ্রীর উত্তরাধিকারের জন্য বংশধরের প্রয়োজন। যাই হোক, এইভাবে পারিবারিক সংগঠন গঠিত হল। এই সংগঠনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে মুখ্যভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ও গৌণভাবে সামাজিক অবস্থার ওপর। অর্থনৈতিক অবস্থা মুখ্য বলার কারণ হল নুন্যতম জৈবিক চাহিদা পূরণ—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সরাসরি পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আর সামাজিক জীবনে রাজারও প্রয়োজন হয়, প্রচুর থাকা সত্ত্বেও মানুষের সমাজ। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় পরিবারের নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এই দুটি বিষয়ের ওপর। আর একথা মনে রাখতে হবে, মানসিক স্বাস্থ্য যে উপাদানগুলির ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল তার প্রধানতম উপাদান হ'ল নিরাপত্তা। কারণ যে মানসিক রোগীদের আমরা চিকিৎসা করি তারা কোন না কোন ভাবে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

আমরা জানি, অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়লে, সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে মনোরোগীদের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু এর থেকে কখনই এমন সিদ্ধান্ত করা যাবে না যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ হলেই প্রত্যেকে অসুস্থ হয়ে পড়বে বা আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভাল হলে মানসিক স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে। যেমন লেলিনগ্রাদের অবরোধের ঘটনাটা আমরা সবাই জানি—সেখানে ঐ ধরনের চরমতম বিপর্যস্তকর অবস্থার মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোধ করার মনোবল সম্পূর্ণ অটুট ছিল। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে মানুষ যখন লড়াই করে তখন অনেকসময়ই তার সহ্যশক্তি বাড়ে, মনোবল বাড়ে, অপরকে সাহায্য করার মত মনের প্রসারতা বাড়ে। আবার আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও দলে দলে লুম্পেন হয়ে, নানাধরনের অনাচার করে দেশ বিদেশের যোগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে সুখের সন্ধান করে বেড়ায়। সুতরাং এ ব্যাপারে এইটুকুই বলা যায় যে ব্যক্তি ও সমষ্টির নানাধরণের আন্তসম্পর্কের কথা মনে রেখেও সাধারণভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থাই মানবমনকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে।

এখানেও মজার ব্যাপার আছে। মানসিক অবস্থা অনেকটাই আপেক্ষিক। একজন উচ্চ শিক্ষিতা, বিত্তশালী মহিলা এসে প্রশ্ন করলেন—ডাক্তারবাবু, এই যে বাড়ী, গাড়ী, সোনা, গয়না, কাপড় এই কি সুখ, এই কি জীবন। অর্থাৎ যথেষ্ট প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তার মানসিক স্বাস্থ্য ধাক্কা খাচ্ছে। আবার জীর্ণদীর্ণ পোষাকে এক ভদ্রলোক এসে বললেন—আমি হিন্দুস্থান মোটরসে কাজ করতাম, কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে—বিক্ষোভ করায়, পুলিশ এসে ব্যাপক ধড়পাকড় করছে, লাঠি চালিয়েছে। তার কিছুদিন পর থেকেই আমার স্ত্রীর এই ভয় আর সন্দেহের রোগটার শুরু হল। দুটোই সত্যি, দুটোই বাস্তব, দুটোই সমাজবিজ্ঞানসম্মত কিন্তু দুটোই আপেক্ষিক।

প্রশ্ন ৩। মনোরোগের ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ—কে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে।

উত্তর। এই দুটি পরিবেশের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। সাধারণভাবে আমরা জানি ব্যক্তি পরিবারের সংগঠনের সাথে যুক্ত আবার পরিবার সমাজ সংগঠনের সাথে যুক্ত। পরিবার না থাকলে ব্যক্তির অস্তিত্ব বিপন্ন। এমনকি যারা পরিবারের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন, তারাও মানসিকভাবে এই প্রস্তুতি নেন যে ছোট পরিবার থেকে বড় পরিবারের সদস্য হলেন তিনি অর্থাৎ পার্টির পরিবারের সদস্য তিনি। আবার পরিবার না থাকলে সমাজ বিপন্ন—অন্তত বর্তমান অবস্থায় (ভবিষ্যৎ সমাজ কি হবে জানি না)। এই পরিবারের কতকগুলি নিয়ম আছে, যে নিয়ম সবাইকে মানতে হয়। আবার পরিবার ঘিরে সমাজ, এরও কতকগুলি নিয়ম আছে। তাও সবাইকে মেনে চলতে হয় নইলে সমাজ বিপন্ন হয়। এগুলি কিন্তু সবই প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য। শৈশব থেকে পরিবার ও সমাজের আর্থসামাজিক সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুটিকে নানা মাধ্যমে সেই নিয়ম নীতিগুলো শেখানো হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে সমাজ ও পরিবার পরিবর্তিত হয়। পুরানো নিয়মের সাথে নূতন নিয়মের সংঘাত হয়, মানবমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, উতলা হয়ে ওঠে। বিজয়ীরা উল্লসিত হয়, নূতন উদ্যমে সমাজ পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। বিজেতারা হয় মেনে নেয়, নয় প্রতিবাদ করে ধ্বসে হয় অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার বিরাট কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের (যুদ্ধ, দাঙ্গা) মধ্যে মাটি থেকে উপড়ে নেয় পরিবার, জাতি, সমাজকে—সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি রসাতলে যায়, প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। ঐ ভয়ংকরীতার মধ্যেও মানবমনের শুভংকর দিক কাজ করে—তার অস্তিত্বের সাথে যুক্ত সেই পরিবার ও সমাজকে ফিরিয়ে আনতে তারা দলে দলে জীবন বিপন্ন করে। এও প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য অচেতন ও সচেতন লড়াই।

তাই যেহেতু দুটি পরিবেশেরই সাধারণ উপাদান 'মানবমন' সেহেতু এটা বলাই বাহুল্য যে এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে তাদের নিজস্ব নিয়মে। কোন কোন সময় পরিবার সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে আবার কখনো সমাজ পরিবারকে

নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার সাপেক্ষেই কথাগুলিকে বিচার করতে হবে। এখন কে যে কখন নিয়ামকের ভূমিকা নেবে তা কখনই আগাম বলা যায় না। কিন্তু বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় এইমাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানবমন, শৈশব ও কৈশোরের গড়ে ওঠার কাল পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং পরিবার তাকে প্রভাবিত করবে সবচেয়ে বেশী, যদি পরিবারের সংগঠন খুব মজবুত হয়। যেমন নিম্নস্তরের পরিবারে বস্তি বা গ্রামাঞ্চলে এই সংগঠন তত মজবুত নয় তাই খুব অল্প বয়স থেকেই সামাজিক পরিবেশ সেখানে মুখ্য ভূমিকায় থাকে। সেখানে সমাজের অপেক্ষাকৃত উঁচুস্তরের মানবমনে, সভ্যসমাজের রীতি নীতি অনেকবেশী মজবুতভাবে প্রোথিত হয়। তাদের মধ্যে থেকেই সমাজ পরিচালনার অগ্রগামী অংশ বেরিয়ে আসে যারা সমাজকে পরিচালনা করেন আবার তাদের শ্রেণী স্বার্থও রক্ষা করেন। তাই শৈশব, কৈশোরের গণ্ডী পেরিয়ে মানবমন যখন সমাজের বৃহত্তর সংগঠনে প্রবেশ করে তখন সামাজিক পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করে অনেক বেশী। এতদূর পর্যন্ত যে সমাজের আহ্বানে সে পরিবারের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সহজলভ্য সমস্ত বিসর্জন দেয়। অবশ্য ব্যক্তির মস্তিষ্কের ধরণ ও পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক কি রকম তার ওপর এই টানাপোড়েন নির্ভরশীল। সুতরাং একথায় কোন ফর্মুলা বলে দেওয়া মুশকিল, শুধু এইটুকুই বলা যায় যে সমাজ ও পরিবারের ভাঙ্গা-গড়ার সাথে সাথে মানবমন dynamic equilibrium রক্ষা করে চলে। আর তা রক্ষিত না হলেই সে বিপন্ন বোধ করে।

প্রশ্ন ৪। পারিবারিক গঠনের পরিবর্তনের সাথে মানসিক রোগ বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কি ?

উত্তর। মনে হচ্ছে তোমরা এই প্রশ্নটির মধ্যে দিয়ে একক পরিবারের সাথে যৌথ পরিবারের ঝগড়া বাধাতে চাইছো। এই নিয়ে ইদানীংকালে প্রচুর আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। পরিষ্কার দুটো দল ভাগ হয়ে গেছে। একদল বলছে মনের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে যৌথ পরিবারই একমাত্র সঠিক জায়গা। তারা বিভিন্ন সমীক্ষার মনোরোগীদের পরিসংখ্যান দিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। অন্যদল বলছেন যৌথ পরিবারে কখনই ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। সুতরাং মানবসভ্যতার বিকাশের প্রয়োজনে একক পরিবার অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি। এই বিতর্কের মাঝখানে পড়ে আসল কথাটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে এই দুই ধরনের পরিবার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। যৌথ পরিবার কৃষিভিত্তিক সমাজের ধরণ, যেখানে পরিবারের ভরণপোষণ হচ্ছে একটি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে, সেটা কৃষি বা কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা। একটি বাড়ীর একজন বড়কর্তা, তার সন্তান, সন্ততি নিয়ে বিরাট সংসারের একটা সিমফনি। বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা থাকলেও একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সুরে তারা সবাই বেজে চলেছে। নতুন সন্তান সেখানে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে কয়েক জন সম্পর্কের কোলে চেপে গড়ে ওঠার কালটুকু পার করে দেয়। সুখে, দুঃখে, বিপদে, আপদে তারা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল ; একে অপরের সাহায্যপ্রার্থী, একে অপরের পরিপূরক, একে অপরের friend, philosopher and guide. যৌথ পরিবার সম্পর্কে আমাদের এই রকম একটা ধারণা আছে। এটা খানিকটা আদর্শস্থানীয়। বাস্তবে পরিবার যৌথ হলেও তার মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ঝগড়া, অশান্তি যে নেই-তা নয়, তবে ঐ কথায় বলে বাটি বাটির ঠোকাঠুকির মত এসব নিয়েও পরিবার টিঁকে আছে। ভেঙ্গে যায় না যে, তার মূখ্য কারণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক। রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যে কখনও মুখ্য ভূমিকা নেয় না এমন নয় তবে তা অপেক্ষাকৃত কম। যাইহোক এইরকম যৌথ পরিবার এখনও অনেক আছে আমাদের সমাজে। আর প্রতিদিন নানান ঘাত-প্রতিঘাতে এই পরিবারগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে একথাও সত্যি। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এই পরিবার মানবমনের বিকাশে কিভাবে সাহায্য করে। এক কথায় বলতে গেলে যৌথ পরিবার আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ জায়গা। একই সংসারের পাঁচটা পাঁচরকমের মানুষ ছোট-বড়, কম-বেশী, তীক্ষ্ণধী-জড়ধী,

একে অপরের সাহায্য নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। পরিবার সেখানে shock absorber মানব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত-কে সহন করার ক্ষমতা সে রাখে। সুতরাং সেইসব পরিবার থেকে মনোরোগীর সংখ্যা কম হবে এটা আশা করা অন্যায় নয়।

এইবার একক পরিবারের কথায় আসা যাক। যেখানে যৌথ পরিবারের বিভিন্ন অংশগুলির একত্রে থেকে স্বার্থরক্ষা হচ্ছে না সেখানে একক পরিবারের জন্ম হচ্ছে। আবার জীবিকার প্রয়োজনে যেখানে আমাদের দূরে দূরান্তে যেতে হয় সেখানে একক পরিবার ছাড়া উপায় থাকে না। বিশেষত কৃষিসভ্যতা বিকলিত হয়ে যত শিল্প সভ্যতার দিকে ধাবমান হচ্ছে—তত শিল্পায়ন বাড়ছে, নগরায়ণ বাড়ছে সেইসঙ্গে একক পরিবারও বাড়ছে। কাজেই সভ্যতা যত বিকলিত হবে একক পরিবারের সংখ্যা তত বাড়বে কারণ শিল্পের সংগঠনের মধ্যে শ্রমের বিভাগ, বিভিন্ন পেশা ও তার বিশেষজ্ঞদের বিভাগ এমনই যে সেখানে যৌথ পরিবারের ভিত্তি নেই। মানসিকতার বিচ্ছিন্নতার শুরুও হয় এখান থেকে। যৌথ পরিবারে সে অনেকবেশী নিরাপদ ছিল। এখানে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক, যুদ্ধাভিত্তিক সমাজে তাকে সাহায্য করার জন্য আছে তার স্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েরা। কাজেই যে সব ব্যক্তি দুর্বল মস্তিষ্কের তারা সহজেই নানান সামাজিক পীড়নের শিকার হয়ে পড়ে। এই কারণে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ার জন্য তার আকুতি অনেক বেশী থাকে। এইসব দিকগুলির পরেও একক পরিবারের একটি উজ্জ্বল দিক আছে। তা হ'ল ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশের অর্থ। যা যৌথ পরিবারে প্রায় অনুপস্থিত। নানান বাঁধা বন্ধনে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে না—যেমন Engles বলেছেন Freedom is the recognition of necessity. এই স্বাধীনতা যৌথ পরিবারে সব সময় আশা করা যায় না কারণ সবার স্বার্থ রক্ষা করে সেখানে নিজেকে বাজাতে হয়। একক পরিবারে কিন্তু সে অবস্থা নয়। এখানে ব্যক্তি অনেকবেশী স্বনির্ভর, দায়িত্বশীল ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। সঠিক পরিচর্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে এই একক পরিবারের ব্যক্তি মানুষই হবে ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষ। কারণ নিজেকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারার জন্য তার স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, পরশ্রীকাতরতা অনেক কমে যাবে। প্রতিটি মানুষকে সে মর্যাদা দেবে। নিজে বিচ্ছিন্নতার শিকার হওয়ায় বৃহত্তর স্বার্থে যুক্তবদ্ধতার জন্য থাকবে তার আকুতি। তাই বৃহত্তর স্বার্থে অনেক বেশী বেশী করে সে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

এখানে পাশ্চাত্যদেশীয় কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়বে। কারণ শিল্পবিপ্লব ও নগরায়ণ এমন সুন্দর ও চমৎকারভাবে একটা সামাজিক নিয়ম মেনে সেখানে হয়েছে যে যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারে নেমে আসার ব্যাপারটি সেখানে ঘটেছে প্রায় সিমফনির মত যেন ব্যাকরণের নিয়ম মেনে। আর আমাদের এশিয়ায় তা ঘটেছে গুণার মির্ডালের ভাষায় 'সাইকো-সেটেড ফ্যাশন'। অর্থাৎ সেই সরল অঙ্কের দু তিনটে স্টেপ লাফিয়ে নানাধরনের বেনিয়ম করে। ফলে ওদেশের Nuclear family সম্পর্কে যে ধারণা পাঠ্যপুস্তকে আমরা পাই তা' ঠিক আমাদের সাথে মিলবে না। আমাদের নানান ধরনের অসম বিকাশের ফলে প্রায় বহুক্ষেত্রেই ঠিক সংজ্ঞানুযায়ী একক পরিবার আমরা বলতে পারি না। রান্নাঘর আলাদা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীর চেয়ে মা, বোন, ভাই-এর সাথে emotional attachment অনেক গভীর বিশেষত : ভায়ের সাথে। সুতরাং একক পরিবারের যে বিশেষত্ব তা' আমরা সবসময় দেখতে পাই না। আরও ভেবে দেখার ব্যাপার হ'ল এখন পঁচিশ ত্রিশ বছরের একটি মেয়ে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পূর্ণ করে তার নিজের পরিবার থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে একেবারে ঘুলটংপাটিত হয়ে। ওদিকে স্বামীও ইতিমধ্যে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। এবং এমন একজনের সাথে তাকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে যাকে সে জানা, চেনার সুযোগ পায় নি। সুতরাং এই মিলনের একক পরিবার কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করবে এটা বলাই বাহুল্য। তাই প্রায়শই শোনা যায়

শাশুড়ী, ননদের অত্যাচার কি বউ-এর উচ্ছৃঙ্খলতা, কি স্বামীর দাবিয়ে রাখার প্রবণতা ইত্যাদি। সেজন্য আমাদের একক পরিবারকে বর্ধিত একক পরিবার বলাই বাঞ্ছনীয়।

তাহলে তোমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী পরিবারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা চিন্তা করতে হবে তা হ'ল মানসিক রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা। কারণ যতদিন যাচ্ছে তত পরিবার ছোট হচ্ছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে এটা তর্কাতীত সত্য। আমার মনে হয় না মনের রোগ বাড়ছে, মনরোগীর সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে মোটামুটি একই আছে। তবে এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কারণ এই নিয়ে কোন বড় আকারের সমীক্ষাতো আমরা করি নি। সুতরাং মনোরোগীর সংখ্যা যদি বৃদ্ধি না হয় তাহলে মেনে নিতে হবে পরিবারের গঠনের পরিবর্তন মানবমনে ছাপ ফেললেও তাকে অসুস্থ করে তুলছে না। শুধু পরিবার কেন, সামাজিক পরিবর্তন কি অসম্ভব দ্রুততার সাথে ঘটছে, চিন্তা কর। এই নানান ধরনের ভয়ংকর পরিবেশদূষণ আনবিক যুদ্ধপ্রস্তুতি ইত্যাদি প্রতিকূলতার মধ্যেওতো মানুষ এগিয়ে চলেছে। কাজেই আমার মত জীবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া একজন বৃদ্ধের কাছে শেষ আশার বাণী একটাই যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজন করার ক্ষমতা মানবমনের তথা মানবমস্তিষ্কের অসীম।

প্রশ্ন ৫। মনোরোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ধরণ বা তার পরিবেশ—কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার মনে হয়।

উত্তর ঃ এটাই বোধহয় পাভলভপন্থীদের বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তির ধরণ, তার বিশেষত্ব, তার চিন্তাভাবনা ইত্যাদিকে তারা বাইরের পরিবেশের মত সমান গুরুত্ব দেয়। আমাদের প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে যখন পরিবেশের কথা চিন্তা করা হয় তখন পরিবেশই নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে যান্ত্রিকভাবে। আবার ব্যক্তি-মনোবিজ্ঞানে (Individual Psychology) যান্ত্রিকভাবে ব্যক্তিকে দেখা হয় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আমরা বলি ব্যক্তি তার পরিবেশের সাথে একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

ব্যক্তি তার মস্তিষ্কের সবলতা, দুর্বলতা, ভারসাম্যতা, গতিময়তা, শক্তি ইত্যাদি নিয়ে পরিবেশের কাছে হাজির। এখন পরিবেশ তার উদ্দীপকের সাহায্য ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে শুরু করল। এবং এই শৈশব ও কৈশোরে পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে তার মধ্যে যে শর্তাধীন পরাবর্তগুলি গঠিত হয় সেগুলি ক্রমাগত Reinforcement এর মধ্যে দিয়ে অনেককাল স্থায়ী হয় এবং ব্যক্তির বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং এই সময় মস্তিষ্কের বৌদ্ধিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশ যদি ঠিকমত না হয় তাহলে তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে কোনকিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। যেমন যতখানি অস্বাভাবিক, অসামাঞ্জিকভাবেই গড়ে উঠুক না কেন পরবর্তীকালে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে মস্তিষ্কের নিয়ম ও ধারনক্ষমতা অনুযায়ী তাও পরিবর্তিত হতে পারে। তবে সবকিছুরই সীমাবদ্ধতা আছে এটাও মনে রাখতে হবে। এখন একথা বলা খুব কঠিন যে ব্যক্তির ধরণ বা পরিবেশ কোনটি কেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যক্তির ধরণের ও তার পরিবেশের বিভিন্নতা না থাকলে সবাই আমরা একই ধরণের ছাঁচে ঢালা মানুষ হতাম। কিন্তু তাতো হয় না—ব্যক্তি তার ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবেশকে নিয়ন্ত্রন করে, পরিবেশ তার ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রন করে। দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মনোরোগের ক্ষেত্রে কয়েকটা কথা খেয়াল রাখতেই হবে যেমন এখনও পর্যন্ত, সঠিকভাবে প্রমাণিত না হলেও আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা বলে—প্রধান মনোরোগ স্কিজোফ্রেনিয়ার একটা বংশগতির সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে কারোর স্কিজোফ্রেনিয়া থাকলে তার সন্তান-সন্ততি বা নিকট, দূরে আত্মীয়দের বংশগতিতে তার বৈশিষ্ট্য

বহমান হয়। এটাকে এখন Genotypic Vulnerability বলা হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যক্তির মস্তিষ্কের গঠনপ্রকৃতিতে স্কিজোফ্রেনিক হবার বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে যাচ্ছে যা পরবর্তীকালে পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন রকমভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে একটা মস্তবড় বিতর্ক আছে familial বা পরিবারসঞ্জাত এই কথাটির সঙ্গে। পাশ্চাত্য দেশে অনেকখানি জোর দিয়ে কতকগুলো কথা বলা হয় যেমন psychotogenetic parents, high expressed emotional environment, schizophrenic mother, double binding parents, schizmatic বা skewed marriage, pseudomutual adjustment, living with a chronically mentally ill member, critical comments ইত্যাদি। এখানে বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়েও বলা যায় যে একটা অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই হচ্ছে—যদি পরিবারে বাবা, মা যে কেউ বা উভয়েই বা অন্য কেউ অস্বভাবী মনের অধিকারী হয় তাহলে শিশুটির ওপর গভীর ছাপ পড়ে ও তার মনোরোগী হবার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়। একটা উদাহরণ দিই—যাকে ওরা double binding parents বলে—বাবা, মা একেবারে দুটি ধরনের। একত্রে সংসার করতে গেলে যে মিলমিশ থাকার দরকার তা একেবারে নেই, এমন পর্যায়ে যে একে অপরকে সহ্য করতে পারেন না। এই নিয়েও তারা কোনক্রমে সংসার করছেন। তাহলে সে পরিবারে শিশুর অবস্থা কি হবে। সে কার দিকে যাবে—বাবা না মা। তাছাড়া সবচেয়ে যে জিনিষটা তাকে প্রভাবিত করবে তা হ'ল নিরপত্তাহীনতা। কারণ বাবা-মা সংসারটি ধরে রাখতে না পারলে সে যাবে কোথায়। সুতরাং তার মনোরোগী হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। তেমনি গুরুত্বপূর্ণ, পরিবারে যদি একটি বহুদিনের পুরাতন স্কিজোফ্রেনিক থাকে। তাছাড়া শিক্ষিত পরিবারগুলির collective sense of worthness মানবমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

এইবার অন্যদিক থেকে ব্যাপারটি বিচার করছি। কোন একজন ব্যক্তি বিষণ্ণতায় ভুগছে। সেইসময় পরিবেশের সবকিছুই তার কাছে পীড়নমূলক (stressful) মনে হতে পারে। এমনকি মানসিকভাবে তাকে সাহায্য করলেও সেই সাহায্য নেবার মত অবস্থাও তার থাকে না সুতরাং তার বিষণ্ণতা বাড়তে থাকে। আবার কেউ বিষণ্ণতায় ভুগছেন এবং তিনি মানসিকভাবে সাহায্য চাইছেন কিন্তু তার পরিবেশ থেকে পাচ্ছেন না। একটু সাহায্য পেলেই হয়তো তিনি সবল হয়ে উঠতে পারেন। আবার কোন ব্যক্তি, হয়তো ঠিকই চলছিলেন কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে এমন উৎপীড়িত হলেন এবং সেইসময় এমনভাবে অভিভাবিত হলেন যে মনোরোগের শিকার হলেন। এই যে ব্যক্তির সাথে পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসম্পর্ক তা খুবই জটিল এবং কোনকিছুই পূর্বনির্ধারিত নয়। একই কথা আজ কাউকে বললাম তার প্রতিক্রিয়া একরকম হ'ল। কাল সেই এককথাই বললাম প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হল। এমনকি বলার ধরণ আলাদা হলে প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হতে পারে। এই যে অসম্ভব variability—এটার জন্যেই বোধহয় আমরা মানুষ। অসীম সম্ভাবীন পরাবর্তের ক্ষমতা নিয়ে আমরা জন্মাই। সেই ক্ষমতা নিয়ে পরিবেশের সাথে অভিযোজন করি নয়তো কোন কিছুই উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে কাজে লাগে লাগে না, প্রতিদিনকার খরচের মত অপচিত হয়ে যাই। তাওতো আমরা মানবমস্তিষ্কের অনেক কিছুই জানতে পারিনি। ভবিষ্যতে হয়তো আরো জানা যাবে তখন বলা যাবে কেন একই পরিবেশ পেয়ে একজন প্রতিভাবান হয় অন্যজন সাধারণভাবে জীবনযাপন করে।

প্রশ্ন ৬। মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি ?

উত্তর : এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া কঠিন। এতো ম্যালেরিয়া নয় যে বলব, মশককুল থেকে সাবধানে থাকুন। কি পেটের রোগ হচ্ছে—জল ফুটিয়ে খান। মানসিক রোগের হাজারেটা কারণ আছে সুতরাং কিভাবে তাকে সুরক্ষিত করার ফর্মুলা বার করা যাবে। তার চেয়ে ভালো ব্যক্তিকে বলা—যত বেশী সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার যথার্থ

বিশ্লেষণ করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন তত নানান প্রতিকূলতার মধ্যে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য আপনার মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে। তবে শরীরের সাথে মনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। কেননা মন খারাপ হলে যেমন শরীর খারাপ হয় তেমনি শরীর খারাপ হলেও মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। সুতরাং অপুষ্টি, যে কোন রকমের ক্রনিক অসুখ, অত্যাধিক মদ্যপান বা অন্যান্য নেশা থেকে অতি অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। শারীরিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে মনের জোর বেড়ে যায়। সুতরাং জনসাধারণের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটবে। তারপর পরিবারে শিশু, কিশোরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবশ্য, অবহেলা যেমন খারাপ তেমন খারাপ অতিমাত্রায় আদর ও প্রশ্রয়। কিশোর ষোল সতেরো বছর হলেই তার সাথে বাবা মায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। কারণ এই সময়টায় তার সনাক্তিকরণের সমস্যা থাকে সুতরাং বাবা-মা সচেতন না হলে কিশোরের বিপথে চলে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া আজকাল প্রতিযোগিতার বাজারে ছেলেমেয়েদের ভালো রেজাল্ট করার নামে যে চাপ সৃষ্টি করা হয় এও একধরনের অসুস্থ করার রাস্তা। আর ছেলেমেয়ে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক সমস্যাগুলো বুঝতে সাহায্য করতে হবে। সেগুলো থেকে দূরে রাখা বা তার প্রতি নজর সরিয়ে রাখার অর্থ তার বিরুদ্ধে সাহায্য না করা। কারণ অন্ধ হলেতো প্রলয় বন্ধ হয় না। সুতরাং তার মধ্যে বুদ্ধি, বুদ্ধি বিবেচনা করার অভ্যাসগুলো গড়ে দিতে হবে। আর আজকালকার প্রজন্মরা অনেকবেশী বুদ্ধিমান আমাদের চেয়ে। কারণ এই সময় অনেক বেশী জটিল ও গতিময়। তাছাড়া দূরদর্শনের প্রভাব স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আর সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে এর ফল কি হয় তা দেখার জন্য।

যৌথ পরিবার না একক পরিবার—এই নিয়ে বোধহয় ভেবে লাভ নেই। কারণ সামাজিক প্রয়োজনে পরিবার তৈরী হয়, সুতরাং মানবমনও তার সাথে সেইভাবে অভিযোজন করে নেবে।

আর্থসামাজিক অবস্থা নিরূপণের ভূমিকায় আমরা কেউ নেই সুতরাং সেখানেও যুক্তি প্রয়োজন অনুযায়ী মানিয়ে নিচ্ছি, নেবে এমন আশা করাই ভালো। আর যে দেশের সত্তর, আশি ভাগ লোককে শুধুমাত্র উদরপূর্তির জন্য পনেরো ঘন্টা পরিশ্রম করতে হয় সেখানে মানসিক স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করা বোধহয় বিলাসিতা। কাজেই সে ধৃষ্টতা আর নাইবা করলাম।

অনুলেখক : বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

আমরা ব্যর্থ হয়েছি

অম্মা মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক কালে যে ঘটনা নিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন এবং প্রায় বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে গেল, রাজস্থানের দেওরালার সেই সতীদাহর ঘটনা নিয়ে কিছু আলোচনা না করলে 'মানবমনে'র নারী ও শিশুবিভাগের পাতায় ত্রুটি থেকে যাবে। রূপ কানোয়ারের সতীদাহর ঘটনা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বহু আলোচনা হয়েছে. এবং স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ্য করতে হয়েছে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে এমন লোকও আছেন যাঁরা প্রকাশ্যভাবে সতীদাহকে সমর্থন করতে লজ্জাবোধ করেন না।

দেওরালার এই সতীদাহ নিয়ে যে সারা ভারত জুড়ে এত আন্দোলন হয়েছে তার অন্যতম কারণ ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই ঘটনা এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়াকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছে। নইলে এই বিশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে আরো সতীদাহর ঘটনা ঘটেছে যা নিয়ে জনসাধারণ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে নি। দেওরালার ঘটনাটিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরার জন্য দেশের প্রচারমাধ্যম ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু কিছু খবর আছে যা সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি, অথচ স্থানীয় কাগজে বেরিয়েছে, যা লোকমুখে শোনা গেছে। সেই সব খবরের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সেই রকম কয়েকটি খবর হল—রাজস্থান রাজ্য সরকারের কোন কোনজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দেওরালার সতীস্থানে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এসেছেন ; রাজস্থানের একজন খ্যাতনামা মহিলা নেতা অল ইন্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সের সতীদাহ বিরোধী স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছেন। (এই সমস্ত ঘটনার প্রমাণ আমার হাতে নেই, তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করলাম না।)

ধর্মীয় বিশ্বাস কী গভীরভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের মনে গেঁথে থাকে দেওরালার ঘটনা ও তার সমর্থক প্রতিক্রিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুলেছে। সতীদাহপ্রথা আইনবিরোধী হওয়ার পরে ১৬০ বছর ধরে সমাজে অন্ধ কুসংস্কার দূর করে যে মানবিক মূল্যবোধ জাগাবার চেষ্টা চলেছিল, অস্বীকার করবার উপায় নেই সেখানে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের আবার নতুন করে এ-সম্বন্ধে প্রচার, আন্দোলন এবং আইন করার কথা ভাবতে হচ্ছে।

উপরন্তু দেখা যাচ্ছে দেওরালার এই ঘটনা এবং তার প্রতিক্রিয়াকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখলে ভুল হবে। সতীদাহর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা ভারত জুড়ে যখন প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে তখনো আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে কোনো বিবৃতি দিতে দ্বিধা বোধ করেছে। সরকারী বিবৃতি এসেছে অনেক পরে। মনে হয় সরকার-পক্ষ বিচার বিবেচনা করে দেখছিল সতীদাহর নিন্দা করলে ভোট লাভ ব্যাহত হবে কি না। এই সূত্রে আমাদের মনে

পড়ছিল শাহবানুর মামলাকে কেন্দ্র করে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন নিয়ে কিছুদিন আগে সারাভারত জুড়ে যে তর্কবিতর্ক ও আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল, এবং কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে মুইপ দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে নতুন লেজিসলেশন পাস করে তাকে যে পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছিল সেই দুঃখের ও জ্বালাকর স্মৃতি। মৌলবাদী মুসলমানরামাত্র একটা নির্বাচনে ভোট কেড়ে নিয়ে সরকারের ওপর চাপ দিয়ে এ রকম ঘটনা ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। সতীদাহর ঘটনা নিয়ে যে চিন্তা আমাদের ভর বিহ্বল করেছিল সে হল এবারেও ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা। সতীদাহ নিয়েও অনুরূপভাবে মৌলবাদী হিন্দুদের পুনরুত্থানের সূচনা দেখা দিয়েছিল। সরকার যে এই মৌলবাদী হিন্দুদের হুমকীতে ভয় পেয়ে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুরূপ আইন প্রণয়ন করবে না, সে সম্বন্ধে কি কোন নিশ্চয়তা ছিল? যাই হোক, মনে হচ্ছে এ যাত্রায় আমরা ভারতীয় হিন্দু মেয়েরা বেঁচে গেলাম, আমাদের আর ধরে বেঁধে স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হবে না, কারণ সতীদাহ বিরোধী আইন প্রস্তাব লোকসভায় গৃহীত হয়েছে।

ধর্মীয় চেতনার মূল সমাজ ও ব্যক্তি মানসে কত গভীর সে সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ আইন পাস করিয়েছিলেন তখন তাঁকে বিধবাবিবাহের সমর্থনে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান উপস্থাপিত করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও যে বিরোধিতার মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছিল সে ইতিহাস আমরা সবাই জানি। অনুরূপভাবে এই সতীদাহর বিষয় নিয়েও দেখতে পেয়েছি উভয়পক্ষই, অর্থাৎ সতীদাহর সমর্থক ও বিরোধী দল, শাস্ত্রের দোহাই আউড়ে গেছে। আমাদের বক্তব্য শাস্ত্রে সতীদাহর সমর্থন আছে কি নেই সে কথা অবান্তর, কারণ শাস্ত্রে যদি সতীদাহর বিধান থেকেও থাকে সে শাস্ত্র আমরা মানবো না। আজ আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এই কথাই বলতে হবে দু'হাজার বছরেরও আগে, যখন কিনা লিখিত ভাষা তৈরী হয় নি, মানুষ কৃষিকাজও শেখে নি, —বর্তমানের তুলনায় অর্ধসভ্য কিছু মানুষ সেই সময়ে যে শাস্ত্র তৈরী করেছিল তাকে আমাদের মানতে হবে কেন? আমরা বর্তমান যুগের মূল্যবোধ দিয়ে এই সমস্ত সামাজিক বিধিনিয়মগুলির বিচার করবো, যেটা গ্রহণযোগ্য তাকে গ্রহন করবো, অন্যগুলি পরিত্যাগ করবো। বিজ্ঞানের অবিষ্কার, শিক্ষার প্রসার, মনীষীগণ কর্তৃক নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন ইত্যাদি কারণে সমাজ, রাষ্ট্র, আইন সব কিছুই পরিবর্তিত হবে, পরিবর্তন হবে না শুধু শাস্ত্রবিধির? আজ আমরা বিরাট সম্পদে ধনী; আমাদের কাছে রয়েছে আজ বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী, রোমারোলা, বার্টান্ড রাসেল, কার্ল মার্কস প্রমুখ মনীষীদের চিন্তার ফসল। আমরা দু'হাজার বছরের পুরোনো বস্তাপচা শাস্ত্র আর মানবো না।

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে কি রকম হাস্যকরভাবে আমরা অতীতকে অনুসরণ করি। বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান ধর্মমত গুলির জন্ম মোটামুটি গত চার হাজার থেকে দেড় হাজার বছরের মধ্যে (এখানে বেদ রচনার সময়কে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জন্ম সময় বলে ধরা হচ্ছে)। চার হাজার বছর আগে একটি বিশেষ ভাষায় বেদগান রচনা হয়েছিল, ভাষার লিপি তখন ছিল না। সেই বৈদিক ভাষার সংস্কার হল, এবং ক্রমক্রমে বৈদিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণে আধুনিক ভাষাগুলি তৈরী হল। কিন্তু এখনো আমাদের ঈশ্বরের আরাধনা বা দেবদেবীর পূজা বৈদিক ভাষা বা শাস্ত্রীয় সংস্কৃত ভাষা ছাড়া হয় না; যেন ঈশ্বর ও দেবদেবীরা শুধু ঐ ভাষাই জানেন, অন্য ভাষা বোঝেন না। অনুরূপ অবস্থা বৌদ্ধ ও ইসলামের বেলাতেও। পালি ছাড়া বৌদ্ধমন্ত্র উচ্চারিত হয় না, আরবী ছাড়া যেন না। একদল খ্রীষ্টানদের গড়ই ভাষা শিখতে পড়ি। যে কোন ভাষাতেই গীর্জায় পাদরীরা সারমন দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে নবজন্ম দিয়ে বিশ্বের দরবারে তাকে একটি সম্পদশালী ভাষায় পরিণত করলেন, কিন্তু তাঁরও প্রার্থনার মন্ত্র ছিল বৈদিক মন্ত্র। আমার এ কথাগুলির ভিতর দিয়ে আমি বৈদিক মন্ত্রকে হেয় করতে চাইছি না, আমি শুধু বলতে চাইছি, ঈশ্বরের কাছে, আল্লার কাছে, দেবদেবীর কাছে আমাদের প্রার্থনার আরাধ্য

পেশ আমরা আমাদের কথাভাষায় করতে পারি না। তেমনি সামাজিক বর্বর প্রথার উচ্ছেদের জন্ত আমাদের শাস্ত্রের দোহাই দিতে হয়।

দেওরালার সতীদাহর ঘটনা নিয়ে ভারত জুড়ে স্থানে স্থানে ভক্তির প্লাবন বয়ে গেল। ভক্তিবাদ এমন একটা জিনিষ যার প্রভাব থেকে মনকে মুক্ত করে যুক্তিবাদের আশ্রয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। মত, বিশ্বাস এবং ভক্তি কোনো যুক্তি দিয়ে এদের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের মত উদার ও বহুদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের ধর্মচেতনাও দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদের মধ্যেই তলিয়ে রইল, সেখান থেকে উঠে রামমোহনের বেদান্তধর্ম বা অদ্বৈতবাদেও পৌঁছতে পারলো না। একমাত্র শেষ জীবনে জগদীশ্বরের করুণাময়তা সম্বন্ধে মনে কিছু সংশয় জেগেছিল, তার প্রমাণ শেষ দুখানা কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর ভক্তির চেয়ে রাজনীতি প্রবলতর ছিল, সে আলোচনা আর করলাম না।

আমেরিকার কম্পিউটার বিজ্ঞানী হারবার্ট সাইমন মানুষের বুদ্ধি ও বিচারের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা হল—

১। যুক্তি ও সত্যনির্ভর মানসিকতার ব্যক্তিরাও একই ঘটনাকে বিভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করেন;

২। যুক্তি দিয়ে পরাজিত করে কোন মানুষের মতের পরিবর্তন ঘটানো যায় না।

এই দুটি সূত্রের ভিত্তিতে গঠিত তাঁর "আবদ্ধ যুক্তিবাদ" (bounded rationality) তত্ত্বের জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। হারবার্ট সাইমনের এই তত্ত্বকে স্মরণে রেখে এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেওরালার সতীদাহর ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মৌলবাদী হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের যে সূচনা দেখা দিয়েছিল তাকে সামান্য ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া অপরিনামদর্শিতার পরিচায়ক হবে। সাম্প্রতিক কালের দুটি ঘটনা আলোচনা করলে এই সত্য উপলব্ধি হবে যে এই ভীতি প্যারানোয়িয়ার পর্যায়ে পড়ে না। এই ঘটনা দুটি হল, ইরানে আয়াতোল্লা খোমিনির নেতৃত্বে মৌলবাদী ইসলামের পুনরুত্থান এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। ইরানে যদিও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু তার শেষ শাহ্ মৌলবাদী ইসলামের (মজলিশ) দমন এবং ভূমিসংস্কার, বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কিছু প্রগতিমূলক কাজ করেছিলেন। কিন্তু আর্থনীতিক সঙ্কট যখন দেখা দিল ১৯৭৮ সালের গণআন্দোলনের ফলশ্রুতি হল আয়াতোল্লা খোমিনির নেতৃত্বে মৌলবাদী ইসলামের শাসন প্রবর্তন এবং ইরানকে ইসলামিক রাজ্য বলে ঘোষণা।

ধর্মোন্মাদনা মানুষকে যে কী পরিমাণ যুক্তিহীন, মানবতাহীন পশু করে তুলতে পারে তার সাক্ষ্য ইতিহাস বারবার দিয়েছে। সে রকম অবস্থা যদি ভারতে কখনো আসে ভোট নির্ভর গণতন্ত্র বা প্রেসিসাইট দিয়ে তার সমাধান করা যাবে কি? যদি না যায়, তবে তার সমাধান কোথায়? এর উত্তর আমার জানা নেই, জানা নেই তখনো আমরা ব্যর্থ হব কিনা।

---

* গত সংখ্যায় লেখিকার যে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটা অনেক আগে প্রকাশিত হবার কথা। বর্তমানে লেখাটির কোনো তাৎপর্য নেই। এই ভুলের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। সম্পাদক

মনোবিদের জল্পনা

দুই

'তমস নিয়ে তত্ত্বকথা

মনোবিদ

গত সংখ্যায় আমরা এই রকম লিখেছিলাম 'অজ্ঞানতা, পুরনো ইতিহাস (বীভৎস ও হিংসোন্মত্ত)' মনে করিয়ে দেবার জন্য টি ভি ফিল্মের মত মিডিয়ামের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। বয়স্ক পাঠকদের জন্য প্রকাশিত পত্র পত্রিকায় ঐতিহাসিক সত্য উন্মোচিত করা উচিত। ৭।৮ থেকে ১৩।১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের মনে ভয়, ঘৃণা, হিংসা ও হত্যা—ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্যগুলোই অনুপ্রবিষ্ট হবে ও তাদের প্রভাবিত করবে। মানবিকতা, মহানুভবতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদির প্রদর্শন ঘৃণ্য মুহূর্তের জন্য রং ছড়িয়ে মিলিয়ে যাবে। নগ্নযৌন প্রক্ষোভ (ধ্বংস, মৃত্যু, হত্যা, ঘৃণা ইত্যাদি) সদর্থক প্রক্ষোভের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। বিশেষত শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে। আদিম মানুষের অজ্ঞানতাজনিত ভয়ের অস্তিত্ব শিশুমনে ও কিশোরমনে অনুভূত হয়। বিভীষিকা, ভয়-হিংস্রতার অভিজ্ঞান 'তমস' টিভি ফিল্মের অনেকখানি জুড়ে আছে। এ ধরণের ছবি ছোটদের পক্ষে ক্ষতিকর। এবার বড়দের কথায় আসা যাক। যাঁরা ইতিহাস ভুলে গেছেন। তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে অনেক পুরনো ঘটনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে—সেই সময়ে যে প্রক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, সেই প্রক্ষোভ তাদের কমবেশী বিচলিত করবে। যাঁরা 'তমসে'র লেখক ও টেলিফিল্ম নির্মাতার সমধর্মী তাঁদের সদর্থক প্রক্ষোভ তাঁদের উৎসাহিত করবে, উজ্জীবিত করবে। কিন্তু যাঁরা ইতিহাস ভুলেছেন, কিন্তু অন্তরের গভীরে সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করে রেখেছেন, তাঁদের মনোভাব বা আচরনিক পরিবর্তনে কোনো সাহায্য করবে না। বরং পুরনো সেই হিংসার উন্মত্ত পরিবেশ স্মৃতির কোঠায় ফিরে আসার জন্য নতুন করে প্রতিশোধস্পৃহা তাঁদের উন্মাদ করে তুলতে পারে। কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে 'তমস' জাতীয় টেলিফিল্ম ক্ষতিকর। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই; আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর শুভকর দিক সীমিত। ভয় বা ক্রোধ জাতীয় প্রক্ষোভ মস্তিষ্কের বিশেষ স্থানের কোষ সমূহকে অতি উত্তেজিত করার ফলে সক্রিয়িত কোষগুলো নিষ্ক্রিয়িত হয়ে যায়, তখন বাইরের কোনো উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। এটাই পরীক্ষিত মস্তিষ্ক ধর্ম। অতি ক্রুদ্ধ বা ভয়ার্ত মনে শান্ত হবার উপদেশ বা ভয়ের কোনো কারণ নেই—এই নির্দেশ, খুব কম ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়। মহাভারতের সেই অতি পরিচিত 'অশ্বত্থামা হত-ইতি গজ'—কথাগুলোর ফলাফল বিচার করলেই ব্যাপারটি বোধগম্য হবে। যুধিষ্ঠির-এর মুখ-নিসৃত এই দুসংবাদ অনায়াসে বিশ্বাস করলেন দ্রোনাচার্য, যিনি জানতেন অশ্বত্থামা অমর, এছাড়া শেষের কথা দুটি (ইতি গজ) তাঁর কানেই ঢুকলো না। যুদ্ধরত দ্রোনাচার্য রণক্ষেত্রের বীভৎস পরিবেশ নগ্নযৌন প্রক্ষোভাধীন। তাই বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগে অক্ষম, সদর্থক কথা দুটি (ইতি গজ) কানে ঢুকলেও মস্তিষ্ক কোষে সাড়া জাগাল না। নগ্নযৌন ধ্বংসাত্মক প্রক্ষোভের তাড়নায় যখন মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি হারিয়ে ফেলে, তখনই সে প্রজাতি হননে প্রবৃত্ত হয়।

ইতিহাস, যে ইতিহাসে আছে হিংসা, হত্যা, আগুন : আছে ধর্মের দিক্ষিত জিগির আর অসহায় নির্দোষ নর-নারীর

প্রাণভরে, আর্তনাদ. সেই ইতিহাস 'অডিওভিসুয়াল' মিডিয়ামে প্রদর্শন করার আগে কেন চিন্তাভাবনা করা দরকার। শিশু ও কিশোরদের কথা না তুলেও বলা চলে যে টিভির পর্দায় সত্য ইতিহাসের ভয়ের ধ্বংসের হিংসার অভিব্যক্তি বয়স্কদের মধ্যে যাদের প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র বেশি শক্তিশালী (অতিমাত্রায় সংবেদনশীল) অথবা যাদের মস্তিষ্ক কোষের উত্তেজনাবর্ধক জোরালো (কোলেরিক) তারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হবে। সিনেমার পর্দাতে বিশেষ প্রকৃতিগত কারণে চিত্রনির্মাতার উদ্দেশ্য বিফল হতে পারে। প্রকৃতিগত কারণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ধ্বংস, নিষ্ঠুরতা, নিরপরাধের নির্যাতন, দাঙ্গা, হত্যা ইত্যাদি নগ্নরূপে বা ক্ষতিকারক প্রক্ষোভ মস্তিষ্ককে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। এই ধরনের দৃশ্য সমাবেশ বেশি থাকলে বুদ্ধিবাদী মানুষও অন্তত সাময়িকভাবে কিছু আতঙ্ক বা ক্রোধে অভিভূত হতে পারেন। বেশির ভাগ মানুষের মনের গভীরে মৃত্যুভয় বিদ্যমান। মৃত্যু সম্পর্কে ভয়ের একটি কারণ এই যে নোটিশ না দিয়েই মৃত্যুদূতের আগমন ঘটে। তাই মৃত্যুকে আমরা অস্বীকার করার প্রয়াসে অবিনশ্বর আত্মার কল্পনা করি। এ-ছাড়া যে দেশে বা সমাজে দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রায়ই ঘটে, বেকারের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ে, শহর ভরে যায় বাস্তুহারা জমিহারা ভিখারীর ভিড়ে, সে দেশের বেশির ভাগ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব থাকবেই তাই 'অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়ামের' সঙ্গে যুক্ত সকলেরই মনে ধ্বংস নিষ্ঠুরতা জিঘাংসার প্রবৃত্তিগুলো মাথাচাড়া দেবে।—এই ভয় কি অমূলক ? দাঙ্গার শুধু ধর্মীয়, জাতি-উপজাতি গত, ভাষা ও অঞ্চলগত পার্থক্য কাজ করে না। এই সম্পর্কে ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান পরিবেশনের নিশ্চই প্রয়োজন আছে। কিন্তু অডিওভিসুয়াল মিডিয়ায় এই ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত ইতিহাসের প্রদর্শন—বয়স্কদের পক্ষেও নিরাপদ নয়। কেননা, ভারতের জাতি-ধর্ম-ভাষাভিত্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাসের এখনও সর্বজনস্বীকৃত রূপ গড়ে ওঠেনি। নিজ ধর্মের লোকের কাছে ঔরঙ্গজেব ধার্মিক, ব্যক্তিগত জীবনে সৎ। অনেক হিন্দু ইতিহাসবেত্তা বলছেন, বিশ্বনাথের মন্দির তিনি নাকি ধ্বংস করেছিলেন। আবার অন্য ধর্মের লোকের কাছে তিনি পরধর্ম-অসহিষ্ণু, অত্যাচারী সম্রাট, জিজিয়া কর ধার্যের অপরাধে নিন্দিত। ঠিক তেমনি শিবাজি স্বধর্মীদের কাছে ত্রাতা ও দেবতারূপে পূজ্য। তাঁর চাতুরি, ছলনা পরবর্তী কালে তাঁর উত্তরসূরীদের লুঠেরাবৃত্তি, বৌদ্ধকরধার্য ইত্যাদির কথা নিরপেক্ষ বা বিপক্ষদের দ্বারা নিন্দিত। অবতারবাদে বিশ্বাসী, মূর্তি পূজায় অভ্যস্ত মানুষদের সঠিক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে না। আবেগিক মনোবিকারে গ্রস্ত না হলেও এঁরা একদেশদর্শী। নিজেদের কোনো তাৎক্ষণিক স্বার্থের সিদ্ধি উদ্দেশ্য এঁদের অনেকের ক্ষেত্রেই থাকে না, তাই জনসাধারণ এঁদের অভিমতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কোনো সম্প্রদায়ের বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অভিন্নতা বোধ (identification) ব্যক্তির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। সেই অভিন্নতাবোধ ব্যক্তিকে নিজের সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে একদেশদর্শী করে তোলে। সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের—যে কোনো রকমের ক্ষতি নিজের ক্ষতি বলে মনে করেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের সুস্থ সমালোচনাতেও এঁরা ঊষ্মা বোধ করেন, নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হয়। এই কথাগুলো যদি মনে রাখা যায় তাহলে সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক দ্বন্দ্ববিরোধের হয়তো কিছুটা সুরাহা করা যায়। তার মাধ্যমে ও সাহায্যে যাঁরা জনমত গঠন করতে চান, ভ্রান্তি নিরসন করতে চান বা সঠিক ইতিহাস শেখাতে চান, তাঁদের নিজ নিজ মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেমন বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার, ঠিক তেমনি দরকার বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান। প্রশিক্ষণের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও তাঁদের জানা উচিত।

Man is a rational animal—কথাটা সত্যি, কিন্তু বুদ্ধির ধাপগুলোর মধ্যে বিষয়নিষ্ঠতা (subjective) অনুপ্রবিষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই প্রাচীনকাল থেকেই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণের ঝোঁক দেখা যায় তার্কিকদের মধ্যে। এর অনেক পরে যান্ত্রিক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণে-বিজ্ঞানমনস্ক পণ্ডিত-

দের কাছে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছবার উপায় বলে সমাদৃত হয়। হয়তো কিছু বেশি কথা বলে ফেললাম। কিন্তু উপায় ছিল না। বিজ্ঞান অনুমোদিত বিশ্লেষণ বিচারকে গুরুত্বাধিকার না দিলে একটি পদ্ধতিকে সঠিক বলে মেনে না নিলে, আমাদের 'কমিউনিকেশন গ্যাপ' থেকেই যাবে এবং আমরা নানাদিকে উন্নতি লাভ করলেও এই গ্রহটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায়—একত্র হয়ে কোনো কাজ করতে পারবো না, কোনো বিষয়ে একমত হতে পারব না। ঐকমত্যহীন গড়ে তোলা দুরূহ হবে।

ফিরে আসা যাক্ এবারে 'তমসে'র তত্ত্বকথায়। এর শিল্প সুষমা, সুসম অভিনয়, চিত্রগ্রহণের কুশলতা ইত্যাদি আমাদের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের বক্তব্য (মানবমন, ১৯৮৮ ১ম সংখ্যায়) 'তমস' টিভি ফিল্ম হিসেবে শিশু ও কিশোরদের পক্ষে আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়। বড়দের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ কিনা, বিশেষ করে ইতিহাস শিক্ষার বা ভুলে যাওয়া পুরনো ইতিহাস মনে করিয়ে দেবার পক্ষে কতটা সাহায্য করবে? তবুই আলোচনার এত কথা বলতে হল।

যাত্রা, নাটক, সিনেমা ফিল্ম ও টিভি ফিল্ম-এরা আপাতদৃষ্টিতে এক জাতীয় হলেও; এদের প্রভাব শ্রোতা-দর্শকদের ওপর একরকম নয়। মনে হয়, এই চার মাধ্যমই বুঝি একই রকমের শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি ও প্রভাবের দিক থেকে এদের টেকনিকাল স্বাতন্ত্র্য বিশেষজ্ঞের কাছে শুধু নয়, আমাদের কাছেও (সুপরিজ্ঞাত না হলেও কিছুটা জানা। আমাদের কাছে বিশেষভাবে যেটুকু জানা সেটা সব টিভি ফিল্ম নির্মাতাদের জানা থাকলে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সব সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। যাঁরা 'তমসের' মত উন্নতমানের টিভি ফিল্ম নির্মানে সক্ষম, তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁদের লাইনের প্রথমশ্রেণীভুক্ত। মিডিয়ার প্রভাবও প্রশিক্ষণ-বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে তাঁরা তাঁদের 'এক্সপারটাইস'কে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারবেন। উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম তাঁদের সফল হবে। আমার কথা শুনে যেন তাঁরা না ভাবেন আমি ওরেই নিয়েছি তারা অজ্ঞ। আমি মনে করি জেনেও তারা প্রয়োগের ব্যাপারে গুরুত্ব দেননি। প্রথমে যাত্রা ও থিয়েটারের কথা আসা যাক। থিয়েটার একেবারে গোড়ার দিকে technically যাত্রার কাছাকাছি ছিল। সিনেমা ফিল্ম আমাদের ছোট বেলায় থিয়েটারেরই ছবি বলে বিবেচিত হত। কেননা, টেকনিকাল দিক থেকে আমরা পিছিয়ে ছিলাম। এখন যাত্রা ও থিয়েটার এবং থিয়েটার ও ফিল্মের সিনেমা প্রভাব ও প্রশিক্ষণ বৈশিষ্ট্য সাধারণে যতটা বোঝে, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ততটা বুঝতেন না। ভিসকন্টির সূক্ষ্মকারুকার্য সিনেমাফিল্মের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আমরা এদের প্রথম বুঝলাম সত্যজিত রায়ের পথের পাঁচালির সময় থেকে প্রতীকের প্রয়োগে প্রতি উৎসাহ হ্রাস পাওয়ার পর থেকে ক্যামেরার বিশেষ ভূমিকার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেল এবং মঞ্চাভিনয় ও সিনেমা পর্দার অভিনয়ে পার্থক্য চিহ্নিত হল। যাত্রা আর থিয়েটারের পার্থক্য-এর মত, মঞ্চাভিনয় ও সিনেমার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য সাধারণের বোধগম্য হল। টিভি ফিল্মের বয়স তা খুব বেশি হলেও পঞ্চাশের কম। কিন্তু ঐশ্বর্য ও গরিমায় অন্যান্য অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে এবং সিনেমাফিল্মকে প্রভাব প্রতিপত্তিতে প্রায় অপাংক্তেয় করে ফেলেছে—মার্কলুহানের মত এই রকম মত যাঁরা পোষণ করেন, আমরা তাঁদের দলে নেই। থিয়েটার এর পাশাপাশি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৬০-এর দশক থেকে পালাগান আরো জনপ্রিয় হয়েছে, সিনেমায় যখন উচ্চমানের ফিল্ম তৈরী হয়েছে, তখন রঙ্গমঞ্চের মৃত্যু ঘটেনি বরং সিনেমা-টেকনিকের দৌলতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো চমক লাগাতে পেরেছে। টিভি ফিল্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সিনেমাফিল্ম অন্তত এখনও পর্যন্ত হটে যায়নি—এটা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

আমরা বোধহয় আমাদের মূল বিষয় থেকে একটু দূরে সরে গেছি। টিভি-ফিল্মের-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় অবশ্য বিভিন্ন মিডিয়ার কথা এসে পড়েছে।

এবার যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমা ফিল্ম ও টিভি ফিল্মের দর্শনভিত্তিক ও শ্রবণভিত্তিক স্বভাবের তারতম্য ও

বিশিষ্টতা আলোচনা করা যেতে পারে। চারপাশে শ্রোতা পরিবৃত হয়ে পালাগানের নট-নটীরা প্রধানত সংলাপের (উচ্চ, স্পষ্ট, সহজ সরল) মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতার শ্রবণ ইন্দ্রিয় মারফৎ তাদের মস্তিষ্কে উদ্দীপনা পাঠান। আলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নট নটীর—চেহারা, চলাফেরা দেখানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়। চারদিকে শ্রোতৃপরিবৃত হয়ে আঙ্গিক অভিনয়, বিশেষ করে চোখমুখের সূক্ষ্ম অভিনয়ের সাহায্যে ভাব অভিব্যক্তি সম্ভব নয়; শব্দের ব্যঞ্জনার ওপর অভিনেতা নির্ভরশীল। 'অডিও' এখানে প্রধান মাধ্যম, 'ভিস্যুয়ালের' ভূমিকা এখানে গৌণ।

থিয়েটারেও প্রথমদিকে 'ভিস্যুয়ালের' ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লব থিয়েটারের 'ভিস্যুয়াল-এর প্রভাবে বৃদ্ধির সহায়ক হয়। আঙ্গিক অভিনয়ে, বাচনিক অভিনয়ে, গুনগত পরিবর্তন ঘটায়। চোখমুখের সূক্ষ্ম-অভিনয়, রঙ্গমঞ্চের নানাবিধ পরিবর্তন, আঙ্গিকের মান উন্নয়ন, আলোক সম্পর্কের বিবিধ কৌশল 'ভিস্যুয়াল' এফেক্টকে' অনেকখানি জোরালো করে।

সিনেমা-ফিল্মের সবাক যুগের আবির্ভাবে সঙ্গে সঙ্গে অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমের প্রভাব ও শক্তি অনেকখানি বাড়ল ভিস্যুয়ালের প্রযুক্তির উন্নয়ণের দরুণ। বাচনিক অভিনয়ের গুরুত্ব হ্রাস পেল, ভিস্যুয়াল-এর মাধ্যমে জটিল ও সূক্ষ্মভাবপ্রকাশের সুযোগ পাওয়া গেল। বাচনিক অভিনয় সিনেমা ফিল্মে অনেক মৃদু নীচুস্কেলের স্বাভাবিক ও কিছুটা ঘরোয়া হয়ে উঠলো। অভিনেতার কণ্ঠে পরিচালকই কথা বলেন সিনেমা ফিল্মে।

সব শেষে এল টিভি ফিল্ম। সিনেমা ফিল্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত প্রকাশের আগে অডিও ভিস্যুয়ালের সংবেদন ও অভিভাবন ক্ষমতা নিয়ে দুচার কথা বলা দরকার।

সংবেদন (hypnosis) ও আনুষঙ্গিক অভিভাবন (suggestion) সম্পর্কিত কিছুটা ধারণা যাত্রা-থিয়েটার, সিনেমা-টিভি ফিল্মের পরিচালকদের নিশ্চয়ই আছে। 'মানবমন'-এর পাঠকদেরও এই সম্পর্কে বেশ কিছু জানা আছে। এ-ছাড়া গণ-সম্মোহন, গণ-অভিভাবন, গণ-হিস্টিরিয়া নিয়ে মনোবিদের লেখার সঙ্গে এই পত্রিকার পাঠকরা পরিচিত। থিয়েটার-সিনেমার আলোচনা-সমালোচনার প্রসঙ্গে এ-সম্পর্কিত উল্লেখ খুব কমই চোখে পড়েছে। তাই 'তমস' টিভি ফিল্মের আলোচনা প্রসঙ্গে মনোবিদ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে দুচার কথা বলা আবশ্যক।

কথকতা, পালাগান, যাত্রা ইত্যাদি গণমাধ্যমে 'অডিও' শ্রুতিভিত্তিক প্রভাব বেশি। 'ভিস্যুয়াল'-দর্শন ইন্দ্রিয় একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্দীপক বাহক। শিশুর 'দর্শন' ইন্দ্রিয় মারফৎ পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে, কিন্তু কান্না, ও অস্ফুট শব্দ দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়। শব্দ যখন অর্থবাহক কথায় হয়ে ওঠে তখন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। চোখের ভাষার তাৎপর্য মুখের ভাষার বাক্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। সভ্যতার আদিমস্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু, পরিবেশের ও প্রকৃতিজাত শব্দের বৈশিষ্ট্য, খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতির বিভিন্নতা, খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ইত্যাদি অনেক কারণে অঞ্চলভিত্তিক ভাষা গড়ে ওঠে। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, অভিভাবনেরও মাধ্যম হয়ে ওঠে। গোষ্ঠী ও সমাজপরিচালনার ব্যাপারে, গোষ্ঠীসত্তার অন্তিত্ব সংরক্ষণে, গোষ্ঠী ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্র পরিচালনে ভাষা হয়ে ওঠে বাহুবল ও অস্ত্রশস্ত্রের মতই বা তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী। শ্রুতি থেকে লিখিত পর্যায়ে উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণ প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বাড়ে এবং ভাষার সাহায্যে অনেক লোককে একসঙ্গে শিক্ষাদান ও চিত্ত বিনোদের কাজ চলে। কথাবার্তা সঙ্গীত পালাগান ইত্যাদি গণমাধ্যমের উপযোগিতা এখনও আছে। তবে থিয়েটার, সিনেমাফিল্ম, ভিডিও, (অডিও-ভিস্যুয়াল) এখন সভা ও

উন্নত সমাজে—প্রধান গণমাধ্যম বলে পরিগণিত। সংবাদপত্র গণমাধ্যম— অডিওভিত্তিক ; প্রভাব প্রতিপত্তি, টিভি রেডিও-এর সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও, এখনও অপ্রতিহত। কিন্তু একদিক থেকে অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়ার তুলনায় অনেক দুর্বল। সংবেদন ও অভিভাবনের ক্ষমতা থিয়েটার, সিনেমাভিত্তিক টিভিফিল্মের অনেক বেশি কিভাবে মানবমনকে এই সব মাধ্যম সংবেদিত, অভিভাবিত করে ? থিয়েটারের কথাই আগে বলা যাক। এখনকার থিয়েটার শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে সারি সারি চেয়ারে অন্ধকারলোকে আসীন দর্শক। সামনে মঞ্চের অভিনীত হচ্ছে একটি মৃত্যুদৃশ্য। নায়কের মৃত্যু হচ্ছে। ম্যাটিনি শো। বেলা তিনটে, মঞ্চে দৃশ্যোপযোগী আলোক সজ্জা ও মন্দ্র সংগীত। দর্শকদের শতকরা আশিজনের চোখ অন্তত ছলছল, কিশোর-কিশোরী ও নারী দর্শকের অনেকেই কান্না চাপতে চেষ্টিত। এদের কেউই পুরো সংবেদিত বা জ্ঞানহারা নন কিন্তু আংশিক সংবেদিত। অবশ্য অভিনয়ের মনে কেন উঁচুদরের এটা আমরা ধরে নিচ্ছি। এদের সকলেই জানেন যে অভিনেতাটি বাবার আজই সন্ধ্যা ৬টার শোতে আর একবার মরবেন। শরৎবাবুর বই পড়তে গেলেও আপনার হয়তো কান্না চাপতে হয়, বা কাঁদেন। আশেপাশে যদি লোকজন থাকে তাহলে হয়তো কান্না না আসতে পারে। সিনেমা ফিল্মের দর্শকেরাও এই ধরনের সংবেদিত, অভিভাবিত হয়ে থাকে। সিনেমা-ফিল্মের অভিনয় ও পরিবেশগত দিক থেকে আরো বেশি বাস্তবানুগ। কিন্তু টিভি-ফিল্মের দর্শকদের অবস্থান একেবারে অন্যরকম তারা একটা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে, সংখ্যায় ৪।১০ জন। ফিল্ম দেখতে দেখতে টেলিফোন-এর বা কলিং বেলের শব্দে সাড়া দিতে হচ্ছে। বাচ্চাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে, এবং হয়তো দু-এক মিনিটের জন্য জরুরী কোনো কাজ সারতে অন্য ঘরে যেতে হচ্ছে। 'তমস' বা 'রামায়ণের' মত অতি-আকর্ষনীয় ফিল্মের ক্ষেত্রে দর্শকরা হয়তো অনেকবেশী অভিনিবিষ্ট অন্যমনা। কিন্তু তবু সংবেদন বা অভিভাবনের প্রভাব টিভি ফিল্মে অনেক কম। ঘরের আলো অনিয়ন্ত্রিত, ছবির পর্দা ছোট দর্শক অন্যের নৈকট্য ও উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। কাজেই পুরনো কিথ্রাস (ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর) কথমূলে আবেশিক (obsessive) ধারণার ওপর অতিসামান্য মাত্রও রেখাপাত করতে পারে কিনা, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভুলে যাওয়া যে ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তার মধ্যে থাকে তিক্ততা বৈরিভাব, নৃশংসতা, ঘৃণ্যে ও বীভৎসতা। গল্পলেখক, ফিল্ম নির্মাতা নিজেরা প্রগতিশীল। ছবির দৃশ্য বা সংলাপে কোনো সম্প্রদায়ের ওপর অন্যায় বা অযথা দোষারোপ করেন নি। ইচ্ছাকৃতভাবে নঞর্থক প্রক্ষোভ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। তাঁর জন্য নিশ্চয়ই তাঁরা আমাদের প্রশংসা পেতে পারেন। কিন্তু তাঁদের যাঁরা সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে মনোবিজ্ঞানের 'তমস'-এর মূল্যায়ন আমাদের জানানো উচিত বলে মনে হয়েছে। টিভি, সিনেমা, থিয়েটারের সমালোচনা এই পত্রিকার বিষয়সূচির মধ্যে পড়ে না। সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু আমাদের বিষয়, আর 'তমস' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দলিল চিত্র না হলেও সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক কারণ বিবৃতির দাবি করেছে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিহাস মনে করিয়ে দেবার দাবি করেছে। তাই আমাদের পত্রিকায় এই প্রথম টিভি-ফিল্ম সমালোচনা প্রকাশ করতে হল।

আর একটি গল্প লেখক ও চিত্র পরিচালকের জানানো উচিত মনে করছি।

ভুল ইতিহাস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ইন্ধন যোগায় নিশ্চয়ই, কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামায় এর খুব বড় ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। দাঙ্গায় যারা মেতে ওঠে যারা তাদের খুব কম সংখ্যকই ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামায়। দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের আদিম সহজাত প্রবৃত্তি-মৃত্যুভয়কে জাগিয়ে তোলায় দাঙ্গা সৃষ্টিকারকদের প্রধান লক্ষ্য। সংখ্যা লঘুদের মনে এই ভয় জাগানো সহজ ; সংখ্যা গরিষ্ঠদের মধ্যেও এই ভয় জাগানো হলেও গুজব সৃষ্টি করে। সেই গুজব বিশেষ পরিবেশে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের পাড়ায় যে দশঘরসংখ্যালঘু প্রাণভয়ে অস্থির হয়ে

আছে, তাদের চিত্রিত করা হয় সংখ্যাগুরুর লোকদের কাছে নানা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বিপক্ষ বাহিনীর 'খোজান হর্স' রূপে। সেই বিশেষ হিস্টিরিক পরিবেশে সংখ্যাগুরুদের শিক্ষিত যুক্তিবাদী, অসাম্প্রদায়িক নিরীহ লোকরা এই বস্তির লোকজনের কাছে 'মিসাইল' এর মত অস্ত্র আছে ও ভিনদেশের গুণ্ডারা আত্মগোপন করে আছে এই ধরনের অদ্ভুত কথা ধ্রুব সত্য বলে মনে করে। ভয় ও উত্তেজনায় কোষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে না। মস্তিষ্ক তখন Paradoxical বা ultraparadoxical অবস্থায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ বা—যাঁরা দাঙ্গা থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফয়দা লুটতে চান তাঁদের মতলব ও পরিকল্পনার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। ইতিহাস তখন ভুল কি সঠিক এ বিচার করার ক্ষমতা কারুর থাকে না। 'তমস' জাতীয় ফিল্মের উদ্দেশ্য সাধিত যে হয়নি ও হতেও পারে না, আমরা এইসব মনোবিদ্যা ও সমাজবিদ্যাসম্মত ধারণার উপর নির্ভর করে—বলতে সাহস পাচ্ছি।

সঠিক ইতিহাস-এর নিশ্চয়ই মূল্য ও উপযোগিতা আছে; কিন্তু টিভি-ফিল্মের ধ্বংসলীলা ও হিংস্রতা-পরিবেশে এর কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণ মূল্য আছে বলে মনে করি না। আর যে ঘটনাগুলিকে (সদর্থক ও মূল্যবোধের) চিত্রায়নের জন্য নির্মাতা বিশেষ সন্তুষ্ট, সে ঘটনাগুলো—(এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেছে) ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে। কলকাতার ৪৬-এর দাঙ্গার সময় ও তারপর ছোটখাটো সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় এই রকম ঘটনা ঘটেছে, সংবাদপত্রে প্রতিবেদনের কলমে এবং নাট্যকারের নাটকে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আবার দাঙ্গা হয়েছে, নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সঠিক ইতিহাস জানা না থাকলে বা মানুষের মধ্যে মানবিকতা বোধ আছে এই তথ্যটি বোধগম্য না হলে—নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়। তা বলে, এ সবের জ্ঞান দাঙ্গা প্রতিরোধের বা সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিচ্ছিন্নতা ব্যাধির মহৌষধ নয়। বুদ্ধ নানক কবির চৈতন্যের প্রভাব অনেক কাল ধরেই বিদ্যমান। গান্ধীজির অহিংসার বাণী ও তাঁর সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হওয়ার ইতিহাস সকলেরই তো জানা। তবুও তো দাঙ্গা হয়েছে ও হচ্ছে। 'তমস' কি নতুন এমন কিছু দিয়েছে বা ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা রোধের প্রতিকার করতে পারে, বা ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান ঘটাতে পারে? আমাদের মত মনোবিদের উত্তর--না।

কারা এই টিভি ফিল্মের দর্শক? কাদের জন্য এ পরিবেশিত? যারা ইতিহাস ভুলে গেছে শুধু তাদের জন্য কি? শিশু ও কিশোর কিশোরী কি ঐ ছবি দেখেনি? এ চিত্রের খুন জখম অগ্নিকাণ্ড বীভৎসতার দৃশ্য তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে—। ভালবাসা মহানুভবতা, স্বার্থত্যাগের চিত্রের প্রভাব ভীতি উদ্রেককারী চিত্রের প্রভাবের মত শক্তিশালী নয়। আমি না মারলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে—নিঃশেষ করে দেবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ প্রজাতি-নিধনে প্রবৃত্ত হয়। গোষ্ঠি ও সমাজ, জাতি, উপজাতি-প্রীতিও কোনো একটি বিশেষ দলের সঙ্গে একাত্মবোধ আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ব্যাপার। শুধু ধর্মীয় চেতনায় মানুষ দাঙ্গা করে, বুদ্ধ করে ভাবলে ভুল হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিটি যোদ্ধারই পকেটে ক্রুশ বিদ্ধ যীশুর ছবি ছিল। ইরান ইরাক মূলত একই ধর্মে দীক্ষিত। আর একবার বলছি-বদ্ধমূল ধারণা (obsession) যুক্তিবুদ্ধিকে অক্রিয় করে, গোষ্ঠীর জাতির স্বধর্মীর বিপদের প্রোপাগান্ডা গণহিস্টিরিয়ার সৃষ্টি করে। 'তমস'-এর মত ছবি নির্মাতার সদিচ্ছা, সদগুণ ও কৃৎকৌশলের প্রশংসা নিশ্চয়ই করি, কিন্তু তাঁর বা তাঁর গুণগ্রাহীদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে এর কোনো বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে করি না।

লেখা শেষ করার পর ১৭।৩।৮৮ তারিখের 'প্রতিক্ষণ' এর 'তমস প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা একটি চিঠির প্রতি নজর

পড়ল। না লেখকের সব মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু তাঁর কিছু বক্তব্য আমার কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে। তাই এখানে উদ্ধৃত করছি।

"নিহালিনির সততার প্রতি সন্দেহ প্রবণ না হয়েও বলব যে 'তমস' এবং নিহালিনি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছেন. 'তমস'-এর বিরুদ্ধে অতি সরলীকরণের অভিযোগ অমূলক নয়। দাঙ্গার উৎস যে রয়েছে আরো অনেক পেছনে, সেই গভীরতর বিশ্লেষণে নিহালিনি যাননি।...আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি, নিহালিনির মত দায়বদ্ধ (?) শিল্পীও সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার ভাঁওতাবাজির পক্ষে ওকালতি করেন। এই সব কথা মাথায় রাখলে স্বভাবতই মনে হয় 'তমস' মূলত নিহালিনির দৃঢ় সচেতনতার অভাবের দরুনই ব্যবহৃত হবে—দুঃখজনক ভাবে; যদিও সব দিক থেকে সদর্থক হতে পারত ছবিটি। (প্রবন্ধলেখক শ্রীমন্মর দেবকে ও 'প্রতিক্ষণকে' ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীদেবের বেশির ভাগ বক্তব্য ও মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই—একথাটাও বলা দরকার।)"

বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ—২য় খণ্ড

বিচ্ছিন্নতা ও বর্তমান ৩০০০

তিনটি নাটক (মরুকন্যা, অপারেশন ফাউন্টাস, কল্মাষপাদ নাটক) ২৫০০

পরিবেশক : এ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স

কলকাতা

মনোবিদের ডায়েরী

বিজ্ঞান বিভীষিকা

মনোবিদ

শিবানন্দ বাবুকে দেখলেই সম্ভ্রমের ভাব আসবে সকলের মনে। তাঁর পোশাক-আশাক অন্য পাঁচজনের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধ ঘোষণা করছে। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, শান্তিপুরের ধুতি, গলায় জড়ানো চাদর—এই পোষাক আমরা ছোট বেলায় কিছু দেখেছি ; এখন শুধু ছবিতেই উনিশ শতকের এই বাঙালিকে দেখা যায়। ঝাঁকড়া চুল ও দাড়ি গোঁফে পাক ধরেছে। নিকেলের ফ্রেমের চশমার ভেতরে দুটো উজ্জ্বল চোখ ঝকঝক করছে। সামনের চেয়ারে বসে যখন আমার দিকে তাকালেন তখন মনে হল তিনি যেন আমাকেই যাচাই করে দেখছেন। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ডান দিকের দেওয়ালের পাভলভের ছবিটির দিকে চোখ ফেরালেন। চোখে মুখে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগগেস করলেন—৮৪ বছরের ছবি ? আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম তাঁর অনুমান সত্যি। তারপর শিবানন্দবাবু আমাকে জেরা করতে শুরু করলেন। জেরা ঠিক বলা যায় না। প্রশ্নবান নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে।

—আপনিই তো মনোবিদ ?—ঠিকই ধরেছি।—আমাকে আসতে বলেছেন কেন ? আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী এটা আপনি বুঝলেন কি করে ? আপনি কি টেলিপ্যাথি জানেন ? অথচ বাজারে রটিয়েছেন যে টেলিপ্যাথিতে আপনী বিশ্বাসী নন। অথচ টেলিকমিউনিকেশন ছাড়া আপনারা একমিনিটও থাকতে পারেন না। টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলেক্স মানবেন আর টেলিপ্যাথি মানবেন না ? একি ধরনের যুক্তিবাদ ? ওঃ হো। আপনিতো ফর্মাল লজিকের লোক নন। আত্মিক তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই আপনি টেলিপ্যাথি 'ক্লেয়ারোভয়েনস্' মানেন না, অথচ 'হিপনোসিস' প্রয়োগে মানুষের গোপন মনের দরজা খুলে তাকে বে-আব্রু করে জনসমাজের কাছে হাজির করেন। আপনাদের কথা নিজেদের সঙ্গে সে কথা বোঝেন কি ? নিজেরা যা বিশ্বাস করেন তা প্রচার করেন না, আর নিজেরা যা প্রচার করেন, তা বিশ্বাস করেন না। ..আপনি আমাকে মনে মনে ডেকেছেন। অথচ বলবেন যে, আমিই টেলিফোনে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কেন তাই স্বীকার করছি। হ্যাঁ, আমিই আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমার কাছে আসেন নি। তাই মেনে নিচ্ছি। এখন বলুন আপনি কি জানতে চান ?

একটানা আমার চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলে গেলেন শিবানন্দ বাবু। মনে হল দাঁড়ি গোঁফের আড়ালে ঢাকা পড়লেও মুখখানা বোধ হয় আমার পরিচিত। কবে কোথায় এঁকে দেখছি ঠিক মনে পড়ছে না বটে তবে শিবানন্দবাবু বাবু যে আমার পূর্ব পরিচিত এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না।

শিবানন্দ বাবুও আমাকে দেখেছিলেন। তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন—কি মনে হচ্ছেনা কি যে আপনি আমাকে মনে মনে খুঁজেছেন, আমাকে ডেকেছেন। আমার নামধাম চেহারা আপনার মনে ছিল না, তাই আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না যে আপনি আমাকেই খুঁজছিলেন। আমি কিন্তু ধরতে পেরেছিলাম, আমার টনক নড়েছিল। আপনারা বলবেন 'ইলেকট্রনিক ডিভাইস,' আমি বলব, আত্মিক শক্তি।

চেয়ারে নড়ে চড়ে বসলেন শিবানন্দ বাবু। আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো গোঁফ দাড়ির আড়ালে।

শিবানন্দ বাবুর ভাগ্নে সতীশ কয়েকদিন আগে আমাকে জানিয়েছিলেন যে শিবানন্দ বাবুকে চিকিৎসকের কাছে আনা দরকার. কিন্তু তিনি প্রয়োজন অনুভব করছেন না। তবে আমাকে নাকি চেনেন. বিজ্ঞানসম্মত জটিল আলোচনার জন্য আমার কাছে আসলেও আসতে পারেন। আমার সঙ্গে নাকি তাঁর আত্মীয়তা আছে। তবে তাঁর আত্মসম্মান বোধ খুবই বেশী। আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, এই কথা শুনলে তিনি হয়তো যেতে পারেন। এরকম কথা অনেক রোগীই বলে থাকেন. আর আমিও স্মৃতিশক্তির গর্ব করতে পারি না। কাজেই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। ভাগ্নেই বোধ হয় তাঁকে জানিয়েছে যে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রয়াসী।

এখন মনে পড়লো কথাগুলো। শিবানন্দ বাবু একাধিক কলেজে চাকরী করেছেন দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে। মতান্তর হলেই মনান্তর হচ্ছে এবং চাকরী ছেড়েছেন। বিয়ে করেন নি। সংসারে আপনার বলতে একমাত্র ভাগ্নে ছাড়া আর কেউ নেই। ভাগ্নের পৈত্রিক বাড়ীর একখানা ঘরে শিবানন্দ মহানন্দে তাঁর তিন আলমারী বই নিয়ে বাস করেন। মাঝে মধ্যে সপ্তাহ কয়েকের মত এদিক ওদিক বেড়িয়ে আসেন। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে আত্মিক শক্তির খোঁজে তিনি বাবাজি. মাতাজি. দাদাজিদের ইন্টারভিউ নিয়ে থাকেন। এখন পর্যন্ত প্রাচীনকালের মত শক্তিশালী কারুরই দেখা পাননি। তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মধ্যে যে আত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটেছিল. ইয়োরোপীয় জড়বিজ্ঞানের চাপে তা বিলুপ্ত হতে চলেছে তাই দেশব্যাপী এত বিভেদ, বিবাদ বিচ্ছিন্নতা। দু'একটা আলোচনা সভায় তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বাদবিসম্বাদ ঘটেছে। জড়বিজ্ঞানের ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য মাঝে মাঝে তিনি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে চিঠি লিখে থাকেন। কিন্তু কিন্তু চিঠি ছাপাও হয়ে থাকে। তাই তাঁকে চেনা. তাঁর কথাগুলোও জানা মনে হচ্ছিল।

বয়স খানেক ধরে তিনি টেলিপ্যাথি প্র্যাকটিস করছেন ও তাঁর আত্মিক শক্তিকে সমৃদ্ধ করে জড়বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টায় আছেন। জাতিসঙ্ঘের নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে. তাঁর ধারণা. সে সবই তাঁরই নির্দেশে। 'পারমানবিক শক্তির প্রতিযোগিতা থেকে দুই মহাশক্তির হাত যে প্রতিনিবৃত্ত হতে চলেছে. সেটা কার চেষ্টায়? এই বলে আবার আলাপরত হলেন শিবানন্দ বাবু। দৃষ্টি এবার পাতালের ছবির দিকে। "আমি মাস্তিরে ৩৭ মিনিট গোর্বাচভকে. ৪৭ মিনিট রেগনকে পুরপাচার চিন্তা মিসাইল দিয়ে সম্মোহিত করে অভিভূত পাঠাই। এবার রাহু আর কেতুকে যদি পোষ মানাতে পারি তাহলেই সব দেশের পারমানবিক অস্ত্র শক্তিহীন হয়ে পড়বে। ভয় নেই. রেডিয়েশন বিপত্তি ঘটবে না। পরমশক্তিতে বিলীন হয়ে যাবে—অস্ত্রের মারনশক্তি। প্রাচীন কালে যেমন হতো!"

এই অবধি বলে হঠাৎ আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন. "হ্যাঁ এবার বলতো বাবা তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি? কি চাই?" চোখে মুখে বাৎসল্য ঝরে পড়ছিল। আমার মুখ দিয়ে অসাবধানে বেরিয়ে এলো যে কথা. তা আমি ঠিক বলতে চাইনি. এইসব রোগীদের সঙ্গে বাদানুবাদ কোনো চিকিৎসকই করেন না। কিন্তু চিকিৎসক হলে কি হয়. আমিও তো মানুষ. আমারো দুর্বলতা আছে। দুম করে বলে বসলাম; "দয়া করে মহাকাল থেকে মহাশক্তি এনে ঘরের ফ্যানটাকে চালু করতো শক্তিধর"। শুধুনি লোডশেডিং এর ফলে ফ্যান থেমে গেল. ঘর অন্ধকার হয়েছে। আমার কথার মধ্যে ক্ষোভের আভাস ওঁর কানে গেল না। উনি শুধুনি টেবিলের ওপর উঠে লাফ দিয়ে ফ্যানের ব্লেড ধরার চেষ্টা করলেন। ভাগ্যে সতর্ক ছিল. আমাকে ঠিক সময়ে বাধা দিয়ে টেবিল থেকে নামিয়ে না আনলে ভদ্রলোকের হাত পা ভাঙবার সম্ভাবনা ছিল। কি কেলেঙ্কারীই না হতো। শিবানন্দ বাবু বেশ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—'এই

ছেলেটা, এই আমার ভয়েটা এতদিন যে আপনার কাছে ঘাতায়াত করছে, আপনি এতদিন ধরতে পারেননি যে ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, স্কেজোফ্রেনী হয়েছে। আমার আত্মশক্তি প্রকাশে বাধা দিয়ে ও যে পাপ করলো। সেই পাপের ফলে পরজন্মে ও আরশুলো হয়ে জন্মাবে। তা সে যাতে না হয় সেটা আমি দেখবো। তুমি এখন ওকে এমন কিছু দাওয়াই দাও যাতে ওর জড়বুদ্ধি একটু ধারালো হয়, ওর আত্মশক্তি বিকশিত হয়।"

এরপর শিবানন্দবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, জড়বুদ্ধি আর জড়বিজ্ঞানে দুনিয়াটা ধ্বংস হতে চলেছে। এ আমি হতে দেব না। পোর্কচপ রেগনকে পোষ মানাচ্ছি, আর এই পুঁচকে ছোকরাকে বাগে আনতে পারবো না"—উঠে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো জ্বলছে। গলা কাঁপছে। আমি সবিনয়ে বললাম, 'প্লিজ, প্রফেসর প্লিজ। আপনি বসুন, বলুন আপনার ভয়ের রোগলক্ষণগুলো, আমি লিখে নিচ্ছি। আশা করছি ওকে—"। আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রফেসর চেঁচিয়ে উঠলেন "ও জানে না, চাষের জন্য, সবুজ বিপ্লবের জন্য সার না হলে চলে, নতুন বীজ না হলে চলে। মূর্খ জানে না যে ওদের বোধ আমারের চেয়ে জাপানের বাস্তিবামারের উৎপাদন বেশি, খরচ কম। ও জানে না যে জাপানী চাষীকে আমরা 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়েছি, ইয়োরোপীয়রা তাকে নোবেল-লরিয়েট করছে না কেন? —কেন? জিজ্ঞাসা করতে দার্শনিক অধ্যাপকের কণ্ঠস্বরে নেমে এলো, চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন। আমার মত সমঝদার শ্রোতা পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন বোঝা গেলো। বলে চললেন, আমি বাধা দিলাম না।

—"জড়বিজ্ঞানের আয়ুকাল শেষ, শেষ হয়ে আসছে উত্তর গোলার্ধের আধিপত্য। প্রাচ্য সভ্যতা সংস্কৃতি দিয়ে আমরা বিশ্বজয় করবো। শক্তির সন্ধান, জড় শক্তির সন্ধানে প্রতিযোগিতায় ওরা পারমানবিক বিস্ফোরণ করেই চলবে, বর্জ্য পদার্থ রাখবার স্থান পাবে না। ভূপৃষ্ঠ বিষাক্ত হবে, মহাসমুদ্র বিষাক্ত হবে, মহাকাল বিষাক্ত হবে। কর্কট রোগে নিঃশেষ হবে দাম্ভিক শ্বেতজাতির অর্ধেক মানুষ; তবে হ্যাঁ, জেনে রেখো, নিউক্লিয়ার ওয়ার আমি হতে দেব না। ওদের পারমানবিক চুল্লীগুলোর ছিদ্র দিয়ে সীমিত রেডিয়েশন ওদের নির্বীর্য করবে, ওদের কয়লা তেল ফুরুবে, পারমানবিক শক্তি কাজে লাগাতে পারবে না। পারবে না সৌররশ্মি থেকে ওদের সীমাহীন শক্তির লালসা মেটাতে, আমাদের কাছে হাটু গেড়ে বসে আত্মিক শক্তিলাভের প্রক্রিয়া শিখতে চাইবে। না না রবিশঙ্করের সেতার নয়, রজনীশের রজনীগন্ধা নয়। মহেশ যোগীর T.M. Transcendental তপশ্চর্যাও নয়। এই শিবানন্দ শর্মার শিবশক্তি যোগ আরাধনার ও-আর্কশপ খোলা হবে দেশে দেশে।

কেন চলছিল ভব গম্ভীর আত্মতোষনের বক্তৃতা। বাদ সাধলেন ভাগনে। বয়স কম, তর্ক করাই স্বভাব। হঠাৎ বলে উঠলেন—"চলো মামা। ডাক্তারবাবুর জন্য রোগীরা ওই ঘরে রাগে ফুঁসছে। পরে একদিন বরং—"

আবার গর্জন ও তর্জন।—"না ডাক্তারবাবু আমাকে ডেকে এনেছেন। তাকে শুনতে হবে আমার কথা। তাছাড়া তোর রোগলক্ষণগুলো তুইতো বলবি না, সব গোপন করবি। তাই আমাকে সব আজই জানিয়ে যেতে হবে।

তুই বলিস, মানুষ সভ্য হচ্ছে, বিজ্ঞানের দৌলতে। মৃত্যুহার কমেছে। উৎপাদন বেড়েছে। মহামারী দুর্ভিক্ষ কবজায় এসেছে। তোদের গর্ব বাষ্পায়ন নিয়ে, অটোমোবাইলে, এয়ারোপ্লেন নিয়ে। জানিস বছরে হাজার হাজার লোক মোটর গাড়িতে চাপা পড়ে মরে। কতগুলো ট্রেন-লাইন চূর্ণ হয়, কতগুলো ট্রেনে ট্রেনে ধাক্কা লাগে বছরে। এয়ারোপ্লেন তো একটা শকুনের ডানার ঝাপটায় হুড়মুড় করে মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে। তোদের এই সভ্য জগতে কত লোকের পেটে অন্ন নেই, পরনের কাপড় নেই, মাথার ওপরে আচ্ছাদন নেই। বিজ্ঞান নিয়ে এত গর্ব করিস কি করে জড়বুদ্ধি হতভাগা। আরো এগুনে চাস? মানুষকে যন্ত্রাংশে পরিণত করেও তোদের সখ মেটেনি। আমি তোদের এই কাচসভ্যতা ধ্বংস করবো, পরশুরামের মত বিজ্ঞানীদের ধ্বংস করবো। নির্বিজ্ঞান করবো এই পৃথিবীকে।

আমার টেবিলের পেপার ওয়েটটা নিয়ে জানালার দেওয়ালে টাঙানো পাতঞ্জলের ছবি লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন এমনি সময় ওঁর স্ত্রী এসে ওঁর হাত থেকে পেপার ওয়েটটা কেড়ে নিল। উত্তেজনা খুব বেশি হয়েছিল। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছিল। প্রফেসর একবার চীৎকার করে উঠে জ্ঞান হারিয়ে ভাতের দুই হাতের মধ্যে ঢলে পড়লেন।

এই অধ্যাপকের কথা আজ মনে পড়লো বিশেষ কারণে। অধ্যাপকের চিন্তাকে আজ আর উন্মাদের চিন্তা বলা চলে না। বিজ্ঞান ও টেকনলজিকে আর অগ্রসর হতে দেওয়া উচিত কিনা—এ নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। বিকল্প শক্তি হিসেবে পারমাণবিক বাষ্পকে ব্যবহার করার—বিপক্ষে যাঁরা তাঁরা সংখ্যাগুরু এবং তাঁদের বক্তব্যের গুরুত্বও বেশি। আবার অপর পক্ষের বক্তব্যের একটা দিক সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের চিন্তা করা দরকার। এঁরা বোধ হয় করছেনও। বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার অগ্রগমনের সেই আগুনে আবিষ্কারের আমল থেকে সব সময় ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে। সভ্যতার ক্ষতির পরিমাণ আর সভ্যতার দরুণ লাভের পরিমাণ খতিয়ে দেখে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে গ্রহণ করেছে, না বিজ্ঞানভিত্তিক টেকনোলজির উপর নির্ভর করতে গিয়ে, তাদের ফেরবার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। যানবাহনের বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের দরুন হাজার হাজার মানুষ সত্যিই দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে। তবু আমরা দ্রুত ও আরামপ্রদ ভ্রমণের নেশা ছাড়তে পারছি না কেন? প্রয়োজন? যদি তাই হয় তাহলে কি আমরা প্রয়োজনের তাগিদেই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিকে কোনোদিনই ছাড়তে পারবো না। আরো একটু বেশী আশাবাদী কিছু বিজ্ঞানী আবার মনে করছেন যে তরোয়াল এর পরই ঢাল আবিষ্কৃত হয়েছিল। সব আবিষ্কারেরই কুফলের—প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক, বিজ্ঞানই আবিষ্কার করবে। তাপ থেকে বিদ্যুৎ শক্তিতে উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ পরিবেশ দূষণ ঘটে, পরমাণু থেকে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে তার থেকে পরিবেশ দূষণ কতটা বেশি হয়? অথবা বেশি হয় না। এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার মত জ্ঞান বুদ্ধি আমাদের নেই। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিজ্ঞ পাঠকদের অভিমত প্রকাশ করতে পারলে আমরা সুখী হব।

বৈশিষ্ট্য আছে এবং গুরুত্ব আছে। তবে একথা নিশ্চয়ই আমরা স্বীকার করবো যে প্রতিষেধী বা পূর্বাবধানের ব্যবস্থা কখনই আমাদের আওতাভুক্ত নয়। আমরা সবসময় চেষ্টা করবো প্রাথমিকভাবে রোগ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে রোগ-প্রতিরোধের যা খরচ তার অনেকগুণ বেশী খরচ হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে মানব সমাজের অপচয় ও যন্ত্রণার কথাও খেয়াল করতে হবে। বিশেষতঃ আমাদের মত গরীব ও উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক রোগ-প্রতিরোধের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এবং এই বিষয়েই আমরা কিছু আলোকপাত করতে চাই। কারণ সর্বদেশের, সর্বকালের বৈজ্ঞানিক স্বীকৃত তথ্যগুলি আমরা সবাই একত্রে কাজে লাগাবো একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রাথমিক স্তরটির ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও, রাজনীতি, সমাজনীতি—দেশের সামগ্রিক পরিকল্পনা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

যে কষ্ট আমরা লাঘব করতে পারি

এখন দেখা যাক আমাদের গ্রামীণ সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যের রোগ-প্রতিরোধের ব্যাপারে নূতন কোন বিষয় আছে কিনা।

(ক) **গর্ভাবস্থার অপুষ্টি :** গর্ভাবস্থায় মায়ের অপুষ্টি বাচ্চার মানসিক প্রতিবন্ধী হবার অন্যতম কারণ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অপুষ্টির মধ্যে আমরা দুটি বিভাগ করতে পারি প্রথমতঃ প্রোটিন ও শক্তির অভাব জনিত এবং দ্বিতীয়তঃ খনিজ ধাতু, ভিটামিন ইত্যাদির অভাব জনিত। প্রথম কারণটি দূর করতে হলে দারিদ্র দূরীকরণের পরিকল্পনা দরকার তাছাড়া দুর্বল শ্রেণী হিসাবে গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প এই ব্যাপারে কাজ করছে তা হ'ল সমন্বিত শিশু বিকাশ প্রকল্প (ICDS). এতে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পরিপূরক পুষ্টি দেওয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত ব্লক বা তালুক জুড়ে এটি নেই। খুব সম্ভবত এখন দেশের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ লোকসংখ্যাকে এর আওতায় আনা হয়েছে। আমাদের আন্দোলন করতে হবে যেন সমগ্র দেশের সব গর্ভবতী মায়েরা এই পুষ্টির সুযোগ পান। তাছাড়া শিক্ষা ও সামাজিক বিকাশের অসমতার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রকল্পটির বিকাশও একরকম নয়। কোথাও কোথাও এই প্রকল্প যেমন কেরল, কর্ণাটকে সামাজিকভাবে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যদিকে বিহার উড়িষ্যাতে এই প্রকল্পের বিকাশ মোটেই আশাপ্রদ নয়। সুতরাং সমগ্র দেশজুড়ে এই প্রকল্পটির সমভাবে বিকাশের কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

দ্বিতীয় কারণটি খনিজ লবণ, ভিটামিন ইত্যাদির অভাবজনিত অপুষ্টি। এ ব্যাপারেও আমাদের যথেষ্ট কাজ করার আছে। কেন্দ্রিয় সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য গ্রামে পৌঁছে দেবার জন্য গর্ভবতী মায়েদের সরবরাহ করছেন আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড যৌগ ট্যাবলেট রূপে। নিঃসন্দেহে ভাল উদ্যোগ কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এতে ফলিক অ্যাসিডের পরিমাণ কম আছে এবং একে B_{12}, B_6, B_{12}, Cu, Zn ইত্যাদি দিয়ে আরো শক্তিশালী করা উচিত। উপর্যুপরি সন্তান, অনাহার, অর্ধাহার ও অত্যধিক পরিশ্রমের চাপে গ্রামের মায়েদের এক বিরাট অংশ অপুষ্টিতে ভুগছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং অল্পবিস্তর মানস-

প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্মদাত্রী তারা হবেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। Rubella নামক একধরণের হাম মস্তিষ্কের ক্ষতি করে (গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের)। তাই এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে পনেরো বছরের মধ্যে সমস্ত কিশোরীকে এই রোগ-প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া যায়। তার ফলে বেশ কিছু মানসিক প্রতিবন্ধী আমরা এড়াতে পারবো।

(খ) **ভূমিষ্ঠজনিত আঘাত :** আমাদের প্রসবের প্রায় ষাট থেকে সত্তর শতাংশ ঘটে বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত বা অশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই-মায়ের হাতে। সুতরাং নিরাপদ প্রসব আমরা শতকরা কটি ক্ষেত্রে আশা করতে পারি? প্রথম কথা দাই-মা-রা তাদের পুরানো অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রপাতি দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করেন। এমনকি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাদের প্রশিক্ষণ দিলেও—It is very difficult to unlearn than to learn. এবং তাদের প্রশিক্ষণও অবহেলিত হয়। সুতরাং আমরা অনুমান করে নিতে পারি এক বিরাট সংখ্যক প্রসবের নবজাতকের শ্বাসরোধকারী অবস্থা হয়। এমনকি P.H.C., S.H.C.-তে A.N.M.-রা যে প্রসবগুলিতে সাহায্য করেন তাও নিরাপদ নয়। কারণ তাদের প্রশিক্ষণ হয় সদর হাসপাতালগুলিতে এবং একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে সেই সময় তাদের কখনই ঠিকভাবে শেখানো হয় না যে জন্মানোর পাঁচ, দশমিনিটের অক্সিজেনের স্বল্পতা নবজাতকটির সমগ্র জীবনের মানস-মন্থন এর কারণ হতে পারে। তাছাড়া দীর্ঘস্থায়ী প্রসব, শুষ্ক প্রসব, কষ্টকর প্রসব, ঝুঁকিজনক গর্ভাবস্থা ইত্যাদির কথা বললে তো অবস্থা আরও ভয়াবহ। তাই আমরা বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি যে নিরাপদ প্রসব ও নবজাতকের শ্বাসরোধ ইত্যাদি বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এবং নবজাতকের ঠিক জন্মানোর পরই বাধ্যতামূলকভাবে তাকে যেন Mouth to Mouth breathing দেওয়া হয়।

(গ) **Iodine-এর অভাব :** Cretinism (শিশুদের গলগণ্ড রোগ)-এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে Iodine যৌগের অভাব এবং গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে যদি কোন মা এই যৌগের অভাবে ভোগেন তাহলে বাচ্চার মানস-মন্থন একেবারে অবধারিত। এই কথা মনে রেখে গলগণ্ড প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত এবং আইন করে অন্য কোন ধরণের লবণ যেন সেখানে বিক্রি না হয় এদিকটাও দেখা উচিত। কোন কোন রাজ্যে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে—অবশ্য তা কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে আমরা জানি না কিন্তু এই ব্যবস্থাদি অবিলম্বে রূপায়িত করা উচিত সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে।

(ঘ) **Reserpine জনিত বিষণ্ণতা :** গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন রোগ সারানোর জন্য বহুল পরিমাণে গাছ গাছড়ার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। এবং এর একটা অংশ সর্পগন্ধা বা হাবেশাই ফকির, কবিরাজেরা ব্যবহার করেন। আমরা জানি সর্পগন্ধায় থাকে Reserpine যা বিষণ্ণতা আনে। সঠিক শতকরা হিসাব আমরা দিতে পারবো না তবে গ্রামে কিছু রোগী আমরা পেয়েছি যারা এইসব গাছ-গাছড়ার ওষুধ ব্যবহার করে বিষণ্ণতায় ভুগছেন।

(ঙ) **অর্শানাকসকেট অধিবিষ :** এটি কৃষির জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য যা বহুল পরিমাণে পোকা মারার ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমরা বেশ কিছু সংখ্যক রোগী পেয়েছি যারা এর

সহযোগে আত্মহত্যার চেষ্টা বা আত্মহত্যায় সফল হয়েছেন। গ্রামের হাসপাতালগুলিতে যারা কাজ করেছেন তারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত হবেন। এবং এ দ্রব্যটি আত্মহত্যার প্রধান অস্ত্র হওয়ার প্রধান কারণ এটি সহজেই যোগাড় করা যায়। এর বিপরীতে যে ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার নাম Pralidoxamine বা জেলা সদরেও পাওয়া যায় না। সুতরাং গ্রামের চিকিৎসক-দের Atropine-এর ওপরই ভরসা করে থাকতে হয়। এবং অনেক রোগীই যারা যায় একথা বলাই বাহুল্য। আত্মহত্যা মৃত্যু ছাড়াও এর বিষক্রিয়ার নানান ধরণের আঙ্গিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। সেইসঙ্গে ধীরগতিতে অনেকদিন ধরে বিষক্রিয়া হলে এর জন্য হতে পারে এক দীর্ঘ তালিকার উপসর্গ যা লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতিই ঘটবে। গ্রামের দিকে রোগীদের যে বৃহৎ অংশটি সোমাটাইজেশন-এ ভুগছেন বলে আমরা মনে করি তার কত শতাংশ এই অতীব্র বিষক্রিয়ায় ভুগছেন আমাদের জানা নেই কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপাততঃ তালিকা শেষ। গ্রামের দিকে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সবচেয়ে বেশী অসুবিধেতে পড়তে হয় মানস প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এবং আমাদের ধারণা এদের একটি বড় অংশই প্রতিরোধযোগ্য।

প্রচলিত ব্যবস্থাদি : কোন কাজের উদ্যোগ নেবার কথা উঠলেই প্রায় সর্বদা আমাদের বলতে শোনা যায়, আমাদের এই চাই, ঐ না হলে কাজ করা সম্ভব না, এইগুলি সরবরাহ করা হয়নি ইত্যাদি। কখনই আমাদের মনে হয় না যে ভেবে দেখি আমাদের কি সুযোগ সুবিধা আছে যা দিয়ে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। এ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা হল গ্রামের দিকে মানব সম্পদের অকল্পনীয় অপচয় হয় বিশেষত স্বাস্থ্য কর্মীদের। একবারে গ্রাম থেকে শুরু করলে—প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা বা অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তা দাই-মারা, প্রতি হাজার জনসংখ্যায় একজন করে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী (C H G); অঙ্গনওয়াড়ী ও তার সহায়িকা, পাঁচ হাজার জনসংখ্যায় একজন করে পুরুষ ও মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী (তাদের একটি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র আছে), প্রতি ত্রিশ হাজার জনসংখ্যায় একটি করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র (S H C) যেখানে চিকিৎসক, কার্যালিষ্ট ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে; প্রতি কুড়ি ত্রিশ হাজার জনসংখ্যায় একজন করে পুরুষ ও মহিলা পরিদর্শিকা (অঙ্গনওয়াড়ী পরিদর্শিকাও আছেন একজন); প্রতি এক থেকে দেড়লক্ষ জনসংখ্যায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যেখানে রোগ প্রতিরোধ (Preventive) ও রোগ চিকিৎসা (Curative)-এর মোটামুটি একটা ব্যবস্থা আছে প্রতি ব্লক স্তরে। প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন চিকিৎসক ও অচিকিৎসক কর্মী সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে থেকে সরকারী কাজ করেন। এত পেয়েও আমরা সন্তুষ্ট নই; এত থেকেও গ্রামের মানুষ সাহায্য পান না। কেননা এই বিশাল জনশক্তিকে কাজে লাগানোর কোন যাদুমন্ত্র আমাদের জানা নেই নইলে জনস্বাস্থ্যের কাজে গ্রামগুলি ভেসে যেত। আমরা চিন্তা করছি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার কাজও আমরা এই কাঠামোর মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করবো। প্রস্তাবটি ভালো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে নূতন করে এই কাজের দায়িত্ব যেন স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে বোঝা না হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই

প্রকৃতভাবে না হলেও কাগজে কলমে তাদের ম্যালেরিয়া, কাইলেরিয়া, কালাজ্বর, কুষ্ঠ, বন্ধ্যা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যান, মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ, পরিবার কল্যাণ, কোন মহামারীজনিত জরুরী অবস্থা তাদের 'ম্যানেজ' করতে হয়। সেইসঙ্গে এটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে ম্যালেরিয়া বা বন্ধ্যার মত মানসিক অসুস্থতা দোজা-সরল কোন একটি রোগজীবাণু দিয়ে ঘটে না। এর প্রায় হাজারটি কারণ আছে তাও সবগুলি চিকিৎসকদের কাছেই স্পষ্ট নয়।

আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই যে গ্রামীণ সমাজে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যারা কাজ শুরু করবেন তারা যেন সহজ সরলভাবে একটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকা প্রস্তুত করেন যা দিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করা যায়। যারা মনরোগ চিকিৎসা নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করেছেন তারা প্রমাণ করেছেন যে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা, হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসার মত সমান ফলপ্রসূ। এটা আমাদের কাছে বড় আশার কথা—এইজন্য যে গ্রামের গরীব, অবহেলিত জনসমষ্টি যাদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসার তেমন কোন ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতেও করে উঠতে পারবো না তাদের মানসিক রোগের বোঝা হালকা করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারি। অল্প আয়াসে বাড়ীতে বসেই তারা সে সুযোগ পেতে পারেন।

সর্বস্তরের অধি প্রশিক্ষণ: যদিও এই বিষয় নিয়ে বহুভাবে আলোচনা হয়েছে তবু মনে হয় আর একবার আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি উল্লেখ করা অথবা পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হবে না। প্রত্যেক সদর হাসপাতালে একটি করে মনোরোগ চিকিৎসার বিভাগ খুলতে হবে এবং কিছু শয্যা সেখানে থাকবে যাতে জরুরী ভিত্তিতে কিছু রোগীকে রাখা যায়। এটি হবে S. H. C., P. H. C., R. H. C., Sub-Divitional Hospital-এর সবচেয়ে কাছাকাছি রেফারেল কেন্দ্র! সেই জেলার সমস্ত চিকিৎসকদের এই বিষয়ের প্রশিক্ষণ সেখানেই হবে—তার ব্যবস্থাদিও এখানে থাকবে। রাজ্যস্তর থেকে বিশেষজ্ঞরা আসবেন। এই বিষয়ের সাথে তারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। সব রকমের কাজের অগ্রগতি ও পর্যালোচনা তারা করবেন। শিক্ষার্থীদের মনে এই ধরণের কাজের একটা ধারণা গড়ে তোলার জন্য জেলা সদরের কাছাকাছি একটি আদর্শ গ্রামীণ মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে।

P. H. C. স্তরে প্রশিক্ষণ হবে স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং অন্যদের। জেলাস্তর থেকে প্রশিক্ষকরা আসবেন এবং চিকিৎসকরা তাদের সাহায্য করবেন। নূন্যতম কতকগুলি কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে: সেইভাবে কাজও শুরু করা হবে। চিকিৎসকরা কাজের পরিদর্শন করবেন এবং জেলাস্তরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বছরের শেষে কাজের পর্যালোচনা করা হবে। এর মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রামে রোগী খুঁজবেন তাদের তালিকা তৈরী করবেন এবং এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতি শনিবারের সাপ্তাহিক আলোচনাসভায় বিস্তারিত আলোচনা করবেন। সাংগঠনিক বা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ অসুবিধার ক্ষেত্রে জেলার বিভাগ সব সময় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সাহায্য করবেন। যদি তারা কখনও অসমর্থ হন তাহলে রাজ্যস্তরের সাহায্য নেবেন। রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলি হবে সর্বোচ্চ রেফারেল কেন্দ্র এবং যে সমস্ত রোগীর বিশেষ চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষানিরীক্ষার দরকার হবে তা

জেলাস্তর থেকে প্রেরিত হবে। রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজগুলিকে কয়েকটি জেলা দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে দেশে এখনও এমন অনেক মেডিক্যাল কলেজ আছে যেখানে সাইকিয়াট্রি ইউনিট কাজ করে না।

এখানে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে। শিশু বিকাশ প্রকল্প এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে এক বিরাট সংখ্যক মা ও শিশুদের ওপর আমরা নজর রাখতে পারি। এই প্রকল্পের মধ্যে আমরা কতকগুলি বাড়তি সুবিধা পাচ্ছি যেমন এটি একটি জাতীয় কর্মসূচী সুতরাং সমগ্র দেশে একইরকমভাবে আমরা কোন কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পারি। তাছাড়া গর্ভবতী, প্রসূতি মা ও দু'বছরের নীচের শিশুদের জন্যে যে পরিকল্পনা এখানে আছে বিশেষত পরিপূরক পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে এই প্রকল্প ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত। তাই আমরা চেষ্টা করলে এই প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—Mental Retardation সম্পর্কিত কর্মসূচী রূপায়ণ করতে পারি। আমাদের পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতায় আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে জনগোষ্ঠী স্তরে যে কোন মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মসূচীতে শিশু বিকাশ প্রকল্প একটি মূল্যবান হাতিয়ার। ঠিক একই কথা বলা যায় বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্পের কর্মীদের (Multipurpose Health Worker) ক্ষেত্রে কারণ এটিও একটি জাতীয় কর্মসূচী। এর পরিচালিকা মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রশিক্ষিত, দক্ষ কর্মী। তাই এদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করতে পারলে সারা দেশ জুড়ে আমরা একই ধরনের কাজ পেতে পারি ;

প্রশিক্ষণ-এর ব্যাপারেও আমাদের কিছু বলার আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, একবার কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কখনই যথেষ্ট নয়। নানান কাজের চাপে ভুলে যাওয়া এবং কাজে গ্রথতা আসাটা স্বাভাবিক। তাই যা দরকার তা হল বারে বারে ছোট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এবং মাঝে মাঝে ঝালাই করার পরই কাজের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে।

সমাপ্তি :

'২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য চাই'—বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এই আহ্বান আমরা গ্রহণ করেছি। আর কয়েকটা বছর আছে দু' হাজার সালে পৌঁছাতে কিন্তু কতখানি যাত্রাপথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে ঘরে ঘরে সবাইকে সুস্বাস্থ্য পৌঁছে দিতে হলে ? সবচেয়ে ভাল উত্তর হল—আমরা জানি না। আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে অন্ততপক্ষে জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের কাজ আমরা দু' হাজার সালের মধ্যে শেষ করতে পারবো না। কিন্তু চরম হতাশাজনক অবস্থা থেকে নিশ্চয়ই আমরা কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

১৯৬৭ সালে মুদালিয়র কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন সে সম্পর্কে কুড়ি বছর এক অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা পালন করা হল। এবং ১৯৮২ সালের আগষ্ট মাসে আমরা এক নূতন আহ্বান শুনলাম—জাতীয় স্তরে মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী রূপায়িত হল সুস্পষ্ট কতকগুলি পরিকল্পনা থেকে বলেই আমাদের মনে হয়। কেননা জাতীয় স্তরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এটিকে রূপায়িত করার জন্য আহ্বান

জানালেন। কিন্তু তার পরও ছ' সাত বছর অতিক্রান্ত হল অথচ আমাদের আশঙ্কা সারা দেশের চিকিৎসকরা এটির (N.M.H.P.) অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত কিনা আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে এটার একটিও কর্মপন্থা রূপায়িত করা তো দূরের কথা বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি ; যাক্ ভবিষ্যতের জন্য আমরা আশা করে রইলাম।

আমাদের মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি ছাড়াও যে জিনিষটার অভাব আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি তা হল নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও অধ্যাবসায় বিশেষতঃ আমাদের এই অসুস্থ, দারিদ্রপীড়িত, রোগগ্রস্থ দেশবাসীর ও জন্মভূমির কথা মনে রেখে। আমরা আমাদের গগনচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মকেন্দ্রিকতা নিয়ে যতখানি ব্যস্ত তারা এক শতাংশও দেশবাসীর কথা মনে রেখে নয়।

(সমাপ্ত)

একুশ শতকের খাদ্য

ডঃ ভিক্তর তুতেলিয়ান

বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ২০০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে ৬১০ কোটি, আর বাইশ শতকের শুরুতে ১,০৫০ কোটি। সমস্যাটা দাঁড়াবে, এত মানুষের খাদ্যসংস্থান হবে কী করে, সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে কি?

খাদ্যের নতুন উৎস

খাদ্যের নতুন উৎস সম্পর্কে মানুষকে এখনই ভাবতে হবে। আমাদের খাদ্য মূলত চর্বি, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিন দিয়ে গঠিত। কিন্তু আমাদের সবার আগে নজর দিতে হবে প্রোটিন তৈরি করার দিকে। তার কারণ বুঝতে হলে জানা দরকার সুষম আহারের প্রধান প্রধান নিয়ম কী?

প্রথমত, মানুষের যে শক্তি ক্ষয় হয় তার পূরণ খাদ্য দিয়ে হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, খাদ্যকে অবশ্যই হতে হবে "নির্মাণকারী উপকরণের" উৎস। তার মানে, এমন সব পদার্থের, যা দিয়ে কোষ পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য অণুগুলি শরীর নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। জ্বালানির জন্য কোষের "পাওয়ার প্লান্ট" ব্যবহার করে চর্বি, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট। অতএব এই তিনটিই সমান শক্তি-দান। "নির্মাণকার্য" আরো অনেক বেশি জটিল ব্যাপার।

কোষের ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে যে প্রোটিন অণু তারা একটি জীবনকালের মধ্যে দুই শতাধিক বার নবায়িত হয়। তাদের নির্মাণের জন্য যে-সব "ইটক" ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ, ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড—সেগুলি জীবদেহ লাভ করতে পারে একমাত্র প্রোটিন সহযোগে। অতএব, প্রোটিনের ঘাটতি হলে বা প্রোটিন উচ্চমানের না হলে, [প্রোটিনের অভাব, রক্তহীনতা ও অন্যান্য গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তার মানে, আমাদের অবশ্যই খাদ্যের নতুন উৎসের দিকে নজর দিতে হবে এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি করতে হবে। যদিও উৎপাদনের বর্তমান মাত্রায় পৃথিবীর মানুষের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিনের যোগান থাকা সম্ভব, তা-সত্ত্বেও আমাদের আহার প্রায়ই সুষম হয় না। তার ফলে উচ্চমানের প্রোটিনের প্রয়োজন থেকেই যায়।

প্রোটিন উৎপাদন

বিভিন্ন দেশে যে-সব গবেষণা হয়েছে তা থেকে প্রোটিন লাভের কয়েকটি উপায় জানা যায় (যেমন, সয়াবীন ও অন্যান্য ডাঁটি জাতীয় উদ্ভিদ)। এই প্রোটিন মাংস বা দুধ বা ডিমের সঙ্গে যোগ করে

প্রোটিনের উৎস বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। প্রোটিনের উৎস বাড়াবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে কী ধরনের গবেষণা চলছে?

একটি উপায় হচ্ছে খাদ্যের প্রচলিত উৎসগুলি থেকে আরও প্রোটিন লাভ করা। যেমন, ছানা-কেটে-নেওয়া দুধে যথেষ্ট প্রোটিন থাকে, অথচ সেটা কাজে লাগানো হয় না। দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের দিকে এমনি অপচয় আরও ঘটে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। কুঁচোমাছ অনেক সময় বড়ো মাছের চেয়ে (কার্প, স্যামন ইত্যাদি) বেশি পুষ্টিকর হয়ে থাকে, তেমন মাংসের যদি নাও হয়। এইসব কুঁচোমাছ থেকেও এখন প্রোটিন তৈরি করা সম্ভব যা মাংসের বড়োমাছের তুল্য, এমনকি তার চেয়েও ভালো। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এমনিভাবে কৃত্রিম প্রোটিন তৈরি হতে পারবে আশা করা চলে। কৃত্রিম খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে মানুষের অবশ্য একটা কুসংস্কার আছে, কিন্তু এই কৃত্রিম খাদ্য হবে স্বাভাবিক খাদ্যের চেয়েও বেশি পুষ্টিকর। সূর্যমুখী ফুল ও তুলাগাছের বইলে যথেষ্ট প্রোটিন আছে, কিন্তু এই প্রোটিন আমরা ব্যবহার করি না। এটা করা দরকার, একমাত্র তাহলেই উৎপাদনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপচয়হীন হতে পারে।

নতুন নতুন সামগ্রীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন, ছত্রাক ও এক-কোষী জীব থেকে প্রোটিন-সমৃদ্ধ পদার্থ পাওয়া সম্ভব। গবেষকরা এ-বিষয়ে কাজ করে চলেছেন। তাঁরা চেষ্টা করছেন, নিম্নমানের প্রোটিনে ঘাটতি অ্যামিনো অ্যাসিড পূরণ করে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে।

ভবিষ্যতের খাদ্য

কোনো কোনো প্রোটিনে এমন পদার্থ থাকে যা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। মাংস ডিম বা দুধের তুলনায় তাদের মানও নিম্ন। তবুও কি নতুন খাদ্য আবিষ্কার করার জন্য কালক্ষেপ করতে হবে?

কোন খাদ্য কতখানি পুষ্টিকর ও কতখানি ক্ষতিকর তা পরীক্ষা করে নির্ণয় করতে অনেক সময় লাগে। অন্তত দু-বছর তো বটেই। তারপরে সেটা গবেষণাগারের জীবজন্তুর ওপরে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। তারপরেই মানুষকে দেওয়া চলে।

এইভাবে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রোটিন মানুষকে আহার্য হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। তাই বলে এক পুরিয়া পাউডার খেয়ে ভোজন সারতে কেউ রাজী হবে না। খাদ্য হওয়া চাই সুস্বাদু।

বিশেষজ্ঞরা তাই নজর দিয়েছেন যাতে কৃত্রিম প্রোটিন সামগ্রীর জন্য নানাপ্রকারের সুগন্ধী তৈরি হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃত্রিম ক্যাভিয়ার তৈরি হয়েছে এটি সূর্যমুখী ফুলের বিচি ও সুগন্ধী দিয়ে প্রস্তুত।

কৃত্রিম খাদ্যের তালিকায় আরও নাম আছে। যেমন, কুঁচোমাছ থেকে কাঁকড়ার মাংস, সয়াবীন থেকে শুকরের মাংস, কুঁচোচিংড়ি থেকে স্যামনমাছ, ইত্যাদি।

তাই বলে ডিম বা দুধ বা মাংস ছেড়ে দিয়ে শুধুই কৃত্রিম খাদ্য দিয়ে চলবে, তা কখনো হয়। ডিম-দুধ-মাংস অবশ্যই থাকবে, এবং আরো বেশি করে থাকবে। কৃত্রিম খাদ্য খাদ্য-লাভের সীমানাকে

বাড়িয়ে তুলবে মাত্র।

প্রোটিন ছাড়া অন্য খাদ্যের কথাও ভাবতে হবে। সব দেশেই বুড়ো মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এ-অবস্থায় সুষম খাদ্যের প্রয়োজন খুবই বেশি। সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে বুড়োবয়সের অনেক রোগ এড়ানো যেতে পারে। ডায়াবিটিসের রোগীর জন্য বিশেষ খাদ্য তো ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য রোগীদের জন্যও অচিরেই হবে।

আমার মনে হয়, নিকট ভবিষ্যতে গবেষকরা প্রোটিন সংশ্লেষণের আরো একটি নতুন প্রকৌশল আবিষ্কার করবেন। মাংসপেশী তৈরি করে যে প্রোটিন—মাইওসিন ও অ্যাকটিন—তার গঠন ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে। এই প্রোটিন তৈরি করার উপায় জীববিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে চলেছেন। এইভাবে পুষ্টিলাভের সমস্যার একটা যুগান্তকারী সমাধান হওয়াটা অসম্ভব নয়।

পৃথিবীর বাইরে সভ্য জগতের সন্ধান

লিথুয়ানিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ভিল্‌নিয়াস-এ একটি সারা-ইউনিয়ন আলোচনা-সভা হয়ে গেল। আলোচনার বিষয় ছিল পৃথিবীর বাইরে সভ্যজগতের অনুসন্ধান এবং তার দার্শনিক ও সাধারণ নীতি।

কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীরা গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এ-বিষয়ে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু কোনো ফললাভ করতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। একটি কারণ এই হতে পারে যে পৃথিবীর বাইরের সভ্যতা কোন নিয়মে গড়ে ওঠে সে-সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ।

নিচের লেখায় প্রফেসর লিওনিদ লেদকভ এ-ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে বলছেন।

পৃথিবীর বাইরে সভ্যজগতের অস্তিত্ব আছে কি? এ-বিষয়ে দুটি মতামত শোনা যায়। প্রথম : বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে বহুসংখ্যক সভ্যজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতালীয় মনীষী জিওর্দানো ব্রুনোর মতামত সমর্থন করা চলে। দ্বিতীয় : যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিবর্তনগত প্রক্রিয়ার সংখ্যাতীত "উদ্ভাবনার" মধ্যে সভ্যজগতের উদ্ভবও একটি মাত্র, তাও এমন একটি যে বিবর্তনগত প্রক্রিয়া লাভ করতে পারে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহলে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব মহাবিশ্বে মানুষের স্থান এবং ব্যাখ্যা করতে পারব কেন কোনো মহাজাগতিক আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে না। একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই দুই মতামত পরস্পর-বিরোধী।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, এই দুই মতামত একই ব্যক্তি প্রকাশ করেছেন—পঁচিশ বছরের ব্যবধানে। প্রথমটি শোনা গিয়েছিল ১৯৬০ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯৮৫ সালে। এই সময়কালের মধ্যে এমন কী ঘটেছে যে পৃথিবীর বাইরে সভ্যজগতের অনুসন্ধানে রত সবচেয়ে কৃতী বিজ্ঞানী—সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাডেমির পদার্থ-গণিত ইতালিক শক্লোভস্কি—এমন নাটকীয়ভাবে তাঁর মতামত বদলে ফেললেন? স্বীকার করতেই হবে, শক্লোভস্কির পক্ষে এমনটি করার গুরুতর কারণ ছিল। গোড়াতেই বলতে হয়, পঁচিশ বছরব্যাপী পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহাবিশ্ব "নির্বাক"—মহাবিশ্বের অন্য কোনো সভ্যজগৎ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো রেডিও সংকেত বা অন্য কোনো সংকেত পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ গবেষক এ-বিষয়ে একমত যে আমাদের গ্রহে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল এমন কিছু যাদৃচ্ছিক ঘটনার ফলে যেগুলো ঘটবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। শক্লোভস্কি তাঁর জীবনের শেষদিকে যে নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার সমর্থকের সংখ্যা বেশি নয়। তবে আশাবাদী যদি হতে হয় তাহলে যুক্তির নির্ভরতা চাই। বিশেষ করে এই কারণে যে সমস্যার কেন্দ্র এমন একদিকে সরে এসেছে যা মানবজাতির পক্ষে আশঙ্কাজনক। বাস্তবিক পক্ষে, কথাটা আমাদের সভ্যতা সম্পর্কেই বলা চলে। নইলে এমন কেন হবে যে আজকের দিনে, যখন আমাদের হাতে রয়েছে অনুসন্ধান ও অবলোকনের অগ্রসর ও সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি, তখনো কেন নক্ষত্রের জগৎ

থেকে কোনো সাড়া ধরতে পাচ্ছি না? এটা কি আমাদের ব্যর্থতার জন্যই নয়? এটা কি এই কারণে নয় যে আমরা এখনো গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু বুঝতে পারিনি, আমরা এখনো সাড়া ধরার অবস্থায় পৌঁছতে পারিনি?

সমাধান খোঁজা হচ্ছে ভিন্ন পথে। একটি নতুনতর ও সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকৌশল হচ্ছে—মহাজাগতিক সভ্যতার বিবর্তনে একটি মডেল খাড়া করা। কয়েক দশক আগে শীর্ষস্থানীয় রুশ বিজ্ঞানী ও মনীষী আকাদেমিশিয়ান ভলাদিমির ভেনাদস্কি এমন এক শিক্ষার ধারণা রূপায়িত করেছিলেন যার নাম 'নু-মণ্ডল' (গ্রীক ভাষায় কথাটার অর্থ বুদ্ধি-মণ্ডল)। এটা হচ্ছে জীবনমণ্ডলের চূড়ান্ত অবস্থা যখন মানুষের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী তৎপরতা রূপান্তরিত হয় একটি হেতুতে যা বায়োজিওসেনোসিস-এর ওপরে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল হয়। এদিক থেকে দেখতে হলে একথা বলা দরকার যে মহাজাগতিক সভ্যতার প্রধান সক্রিয়তা হচ্ছে "সাংস্কৃতিক বায়োজিও-কেমিক্যাল শক্তি" গড়ে তোলা, যার লক্ষ্য হবে সভ্যতার স্বার্থে পারিপার্শ্বিক জগতের সমন্বিত রূপান্তর-সাধন। এই হচ্ছে মহাজাগতিক সভ্যতার বিবর্তনের মৌল সূত্র।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক জগতের রূপান্তর-সাধন করার সময়ে সভ্যতা অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। বরং অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে আরও জটিলতা, আভ্যন্তরীণ কাঠামোর বিবিধায়ন এবং অজস্র নতুন যোগসূত্রের উদ্ভব। এই হচ্ছে মহাজাগতিক সভ্যতার বিবর্তনের দ্বিতীয় সূত্র। মহাজাগতিক সভ্যতার বিবর্তনের এইসব সাধারণ নিয়মানুবর্তিতার ওপরে নির্ভর করেই তার মডেল তৈরী করা যেতে পারে। আমরা যদি সভ্যতার বিবর্তনের সম্ভাব্য প্রধান দিক ও পর্ব নির্ধারণ করতে চাই তাহলে এই মডেলটি দরকার। তাহলে মহাজাগতিক সভ্যতার বিবর্তনের মডেল-অনুসন্ধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি কী?

১। বিবর্তন একটি ভীব্র প্রক্রিয়া। এটা শুধু সীমাহীন পরিমাণগত বৈভব নির্মানেই সীমাবদ্ধ নয়, তারও আগে উন্নতির উচ্চতর স্তরে উত্তরণ সাধনও। এজন্য চাই বৈষয়িক উৎপাদনে আরও সমন্বিত ও অগ্রসর কারিগরী প্রক্রিয়া।

২। শক্তি ব্যবহার করার এবং উৎপাদনগত প্রক্রিয়ার বর্জিত পদার্থ দিয়ে পরিবেশকে ভরাক্রান্ত করার একটা সীমা আছে। পার্থিব সভ্যতার ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবহারের উচ্চতর স্তর হচ্ছে শক্তির সেই স্তর যা সূর্য থেকে এই গ্রহ পেয়ে থাকে।

৩। জনধিত্রী নক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্বে মহাকাশে সভ্যতার প্রসারলাভে একটা সীমা আছে। তার আকার উক্ত নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলের আকারের সমান।

৪। মহাকাশে ব্যাপ্ত সভ্যতা উচ্চতর স্তর লাভ করে এক-হাজার থেকে এক-লক্ষ বছরের মধ্যে। মহা-জাগতিক মাত্রায় এটি বিস্ফোরণ-তুল্য।

৫। মহাজাগতিক সভ্যতার বিবর্তনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক সঙ্কটময় পরিস্থিতি এসে পড়ে। কিন্তু এও দেখা যায়, তার জন্য এমন কোনো ব্যাপার ঘটে না যে এ সভ্যতা আপনা থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মহাজাগতিক সভ্যতা উন্নতির পথ তৈরি করে নিতে পারে এজন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে থাকে।

৩। প্রাযুক্তিক বিবর্তনের একটি পর্বে সভ্যতার এমন উদ্যোগ থাকে না যে অন্যান্য সভ্যজগতের সন্ধানে তার সংস্থান নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু প্রাযুক্তিক বিবর্তনের উচ্চতর স্তর লাভ করার পরে এই প্রয়োজন প্রকাশ পেতে পারে।

এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা চলে। প্রথম কথা প্রাণময় জগতের সংখ্যা বহু—এই ঘটনার সঙ্গে মহাবিশ্বের নির্বাক থাকার ঘটনা মিলিয়ে নেওয়া চলে। অনুসন্ধানের বর্তমান অবস্থায় নির্বাক থাকাটাই স্বাভাবিক। নতুন গবেষণা হলে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। যাই হোক না কেন, এই লেখার শুরুতে যে চূড়ান্ত মতামতের কথা বলা হয়েছে তার কোনো ভিত্তি নেই দ্বিতীয় কথা, মহাকাশের সভ্যতার বিবর্তনের মডেল থেকে দেখা যায়, আমাদের নিজস্ব সভ্যতার উন্নতি আশাপ্রদ। তার মানে পৃথিবীর বাইরে সভ্যজগতের সন্ধান করার ফল যাই হোক, আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের দিকে আমরা আস্থার সঙ্গেই তাকাতে পারি।

প্রকাশিত হয়েছে—

শ্রীবেজরাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ-এর দ্বিতীয় খণ্ড

বিচ্ছিন্নতা ও বর্তমান

দাম: ৩০·০০ টাকা (সুলভ সংস্করণ) □ ৫০·০০ টাকা (গ্রন্থাগার সংস্করণ)

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান পাওয়ায় বইয়ের দাম কমানো হলো।)

—পরিবেশক—

একাডেমিক পাবলিশার্স

কলিকাতা-৭০০ ০৭৯

এই লেখকের তিনটি নাটক—

মরুঝঞ্ঝা। অপারেশন ফাউন্টাস। কন্যাবিষাদ নাটক

দাম: ১৫·০০ টাকা

—সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা—

মানবমন | ১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০০৪

বিজ্ঞান বিচিত্রা

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি আকাদেমিসিয়ান জি. আই. মারচুককে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানদান

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি গুরি আই মারচুক (জন্ম ৮ জুন ১৯২৪) ভারত সফরে আসছেন এবং ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। তাঁর সফর-সূচীতে কলকাতায় আসার তারিখ ১লা এপ্রিল ১৯৮৮। সে-সময়ে, ১লা এপ্রিল তারিখে, একটি বিশেষ সমাবর্তন সভায় তাঁকে ডি এস-সি সম্মানে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সমাবর্তনী ভাষণ দেবেন আকাদেমিসিয়ান মারচুক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক সুকুল হাসান সমাবর্তনে উপস্থিত থাকছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি আকাদেমিসিয়ান গুরি মারচুক তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে কম্পিউটিং গণিত, বায়ুমণ্ডলের পদার্থ বিদ্যা, তৈত্ত ফুগোল ও নিউক্লিয়ার চুল্লির পদার্থবিদ্যা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংগঠক হিসেবেও তিনি কৃতিত্ব-লাভ করেছেন এবং বহু বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের লেখক হিসেবে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে প্রশংসিত হয়েছেন।

গুরি মারচুক বিজ্ঞানের যে সব শাখায় বিশেষভাবে পারদর্শী হয়েছেন তা হচ্ছে বিকিরণ রূপান্তরণ তত্ত্ব, বায়ুমণ্ডল ও মহাসাগরের হাইড্রোথার্মোডায়নামিকস এবং জীবপরিবেশে গাণিতিক মডেলিং। ১৯৫০-এর দশকে নিউক্লিয়ার চুল্লির ডিজাইন হিসাব করার যে প্রকৌশল তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন সেটাই এখনো নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভিত্তি হয়ে রয়েছে, রোগ প্রতিরোধ ও চেষ্টবিদ্যার গাণিতিক মডেলিং-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

গুরি মারচুক সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছেন কম্পিউটার গণিতে অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রকল্পের জন্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির লাইবেরিয়া শাখায় যখন তিনি কাজ করতেন তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংগঠক হিসেবে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এই শাখার কম্পিউটার কেন্দ্রের অধিকর্তা এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই শাখার চেয়ারম্যান। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিরাট এক গবেষণার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল মৌখ ও ফলিত গবেষণা। 'সিবির' নামে তিনি এক সর্বাঙ্গীন কর্মসূচী প্রবর্তন করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল সাইবেরিয়ার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক রাষ্ট্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে গবেষণার সর্বাঙ্গীন কর্মসূচীর একটি জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের (সি এম ই এ) দেশগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা গড়ে উঠেছে তার মূলে আছে তাঁরই প্রয়াস।

তবি মারচুক ১৯৬২ সালে বিজ্ঞান আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৮ সালে সদস্য বা আকাদেমিসিয়ান। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আকাদেমির সহ-সভাপতি।

জননেতা হিসেবে আকাদেমিসিয়ান মারচুক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির ১৫তম কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবং ২৬তম ও ২৭তম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য—সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ডেপুটি।

১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের উপ-চেয়ারম্যান।

বুলগেরিয়া, জিডিআর, চেকোস্লোভাকিয়া ও ফিনল্যাণ্ড—এই সমস্ত দেশের বিজ্ঞান আকাদেমির তিনি সদস্য এবং বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সম্মানজনক ডকটরেট উপাধিতে ভূষিত।

বহু সম্মান তিনি লাভ করেছেন—যথা, হিরো অব সোশ্যালিষ্ট লেবর, অর্ডার অব লেনিন (চারবার), লেনিন পুরস্কার, ইত্যাদি।

মাদক ধরার নতুন পদ্ধতি

অক্সফোর্ড ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ফোরেনসিক একসপারটাইস-এর বিজ্ঞানীরা মাদক ধরার একটি অতি মাত্রায় কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

বিশ্লেষণ করার কাজটি সম্পন্ন হয় ক্রোমাটোগ্রাফ, স্পেকট্রোগ্রাফ ও লেসার যন্ত্রপাতির সাহায্যে। নমুনাটির বর্ণালিসত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। তার চিত্রটি গ্রহণ করা হয় একটি কম্পিউটারের সাহায্যে। নমুনার রাসায়নিক গঠন নির্ধারিত অভিনব নির্ভুলভাবে। ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করার ফলে কোনো রাসায়নিক পদার্থ কণামাত্র থাকলেও তা ধরা পড়ে যায়। এইভাবে মাদকদ্রব্যের ছিটেফোঁটাও ধরা পড়তে থাকে, এবং সেটা ধরা যায় এমন কি সিগারেটের ছাই বা সিরিঞ্জ ধোয়ার জল থেকেও।

ইনষ্টিটিউটের অপর একটি উদ্ভাবন মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে অতিমাত্রায় সহায়ক হবে। মাদকদ্রব্যের কিছু অংশ বেশ খানিকটা সময় থেকে যায় রক্তে ও নিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডে। সিগারেটে একটি মাত্র টান যে দিয়েছে তার ও চুল থেকে গবেষকরা পরবর্তী কালে মাদকদ্রব্যের সন্ধান পেয়ে যাবেন। এমন কি, মাদকদ্রব্য কোন দিন কোন সময়ে সেবন করা হয়েছে তাও ধরতে পারা যাবে।

এইডস রোগের জন্মকথা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জিডিআর-এর বিজ্ঞানীরা স্বতন্ত্রভাবে এই স্বাধীন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এইড্‌স (অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম) রোগ সৃষ্টি করে থাকে যে ভাইরাস—যার নাম এইচ-আই-ভি বা হিউ ভাইরাস—সেটি কৃত্রিমভাবে উদ্ভূত এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে সৃষ্ট। এইড্‌স প্রথম ধরা পড়েছিল নিউ ইয়র্কে, ১৯৭৯ সালে, সেখান থেকে রোগটি সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়েছে পরবর্তী কালে অন্যান্য মহাদেশেও এইড্‌স দেখা দিয়েছে।

ফোর্ট ডেট্রিক-এ সেনাবাহিনীর গবেষণাগারগুলিতে ভাইরাস নিয়ে অতি-ব্যাপক গবেষণা চালানো হয়েছে। গতের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এইটিই ছিল জীবাণুঘটিত অস্ত্র নির্মাণের মার্কিন সেনা-বাহিনীর মুখ্য কেন্দ্র। ১৯৭৭ সাল থেকে ফোর্ট ডেট্রিকের ল্যাবরেটরিতে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে বিশেষ রকমের বিপজ্জনক প্যাথোজেন (রোগ-সৃষ্টিকারী ভাইরাস) নিয়ে পরীক্ষাকার্য চালাবার সময়ে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় থাকে।

ফোর্ট ডেট্রিকে আমেরিকানরা ব্যাপকভাবে মানুষের ওপরে পরীক্ষাকার্য চালিয়েছে।—সৈনিকদের ওপর স্বেচ্ছাসেবকদের ওপরে, বন্দীদের ওপরে। স্নায়ু-অবশকারী গ্যাস বি-জেড দিয়ে পরীক্ষাকার্য চালাবার সময়ে পরীক্ষাধীন মানুষের সংখ্যা ছিল সাত হাজারেরও বেশী। এটাও কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয় যে মানুষের ওপরে হিভ ভাইরাস প্রয়োগ করে দেখা হয়েছিল। এই ভাইরাস শরীরের মধ্যে বহুকাল গুপ্ত অবস্থায় থাকে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পুরনো পদ্ধতিতে এই সুপ্ত অবস্থায় এইড্‌স রোগ ধরা পড়ত না। ফলে, এইড্‌স রোগ শরীরের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে, এমন মানুষও ভালো স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট পেয়ে যেত।

কিন্তু হিভ ভাইরাস যারা আবিষ্কার করেছিল তারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা করেছিল? এই প্রশ্নের জবাব বর্তমান মার্কিন সামরিক ধারণার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট রেগন বলছেন, এস. ডি. আই. (ষ্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ বা তারকা-যুদ্ধ) গড়ে তোলা হচ্ছে সোভিয়েত ব্যালস্টিক ক্ষেপ-ণাস্ত্রকে অকেজো করার জন্য, টীলথ বোমারু বিমান তৈরি করা হচ্ছে সোভিয়েত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অকেজো করার জন্য একই যুক্তি টেনে বলে চলে, হিভ ভাইরাস প্রয়োগ করা হচ্ছে মানুষের শরীরের প্যাথোজেন প্রতিরোধক টীকাকে অকেজো করার জন্য। তার ফলে আমেরিকান জৈব অস্ত্রের প্রাণ-হননের ক্ষমতা মারাত্মক বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা।

হিভ ভাইরাস তৈরি হবার ফলে এবং গবেষণাগারের বাইরে তা ছড়িয়ে পড়ার ফলে এই রোগের ভয়াবহ বিস্তার ঘটেছে এবং বহু মৃত্যু হচ্ছে। ব্যাপার দেখে মার্কিন সামরিক মহলেও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই মার্কিন ডেপুটি সহকারী প্রতিরক্ষা সচিব বলেছেন, জৈব বিজ্ঞানের কৃতিত্ব এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে ছোট একটি গবেষণাগার থেকেও সংক্রামক রোগের ভাইরাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং সংক্রামক রোগ বাধিয়ে মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করতে পারে।

পাঁচ মিনিটে মেডিকেল নিরীক্ষণ

একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স এখন মাত্র পাঁচমিনিটের মধ্যেই একজন রোগীর পরীক্ষাকার্য শেষ করে তাকে বলে দিতে পারে তার অসুস্থতার কারণ কী এবং কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে তাকে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। এটি সম্ভব হয়েছে রোগ-নিরূপণের নতুন একটি যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে। এই যন্ত্র দিয়ে ককলিয়া-র (কানের ভিতরের একটি অংশ যা দিয়ে শ্রবণ করা হয়) নির্দিষ্ট একটি এলাকার বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের মাপ নেওয়া হয়। পর্দায় ফুটে ওঠে এলাকার একটি রঙীন চিত্র। এক-একটি রঙ প্রতিরোধের এক-একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী। তারপরে এই তথ্য একটি কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণ থেকে

'রায়' বেরিয়ে আসে। যন্ত্রটি একই সঙ্গে যে রোগীর কাছে ধরা পড়ার আগেই রোগ ধরা পড়ে।

এই যন্ত্রের একটি পরীক্ষামূলক ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে রিফ্লেকসোথেরাপি ইনস্টিটিউটে। নির্মাণ কার্যে সহযোগিতা করেছে মস্কোর একটি ইনস্টিটিউট যেখানে মেডিকেল যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা হয়। বহু বছরের গবেষণার পরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন কলিয়ার বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরীণ পীড়ার (প্রদাহ ইত্যাদি) সরাসরি সম্পর্ক আছে।

মস্তিষ্ক সংস্থাপনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ

প্রাণীর শরীরে মস্তিষ্ক সংস্থাপনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কয়েকটি সাফল্যমণ্ডিত পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করেছেন। পরীক্ষাকার্য থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে, একটি ভ্রূণের মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুকোষ নিয়ে যদি বয়ঃপ্রাপ্ত জীবদেহের মস্তিষ্কে সংস্থাপন করা হয় তাহলে সেটি টিকে যায় এবং বয়স্ক জীবদেহের মস্তিষ্কের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়েছে ইঁদুর নিয়ে। ইঁদুরের ভ্রূণ থেকে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ তুলে বাড়ী ইঁদুরের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। দেখা গিয়েছে, বাড়ী ইঁদুর তারপরেও কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করেনি। তার মানে, স্নায়ুকোষ তার মস্তিষ্কে সংস্থাপিত হতে পেরেছে।

অঙ্গ সংস্থাপনের ক্রিয়াকাণ্ড শুরু হবার পরে দেখা গিয়েছিল, বাইরে থেকে আরোপ করা টিস্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর শরীরে বর্জিত হয়। টিস্থ যাতে বর্জিত না হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হত। কিন্তু পরীক্ষাকার্য থেকে দেখা গিয়েছে, একমাত্র স্নায়ুকোষই অতি সহজে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াই গ্রাহ্য হয়। আর মস্তিষ্ক সংস্থাপনের বেলায় স্নায়ুকোষটি নিতে হয় ভ্রূণ থেকে।

মস্তিষ্ক সংস্থাপনে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এই সাফল্য বিরাট ভবিষ্যতের সূচনা করছে।

সম্বিৎ-প্রত্যক্ষ

অরুণা হালদার

আচার্য গিরীন্দ্র শেখর বসুর একটা আলোচনা প্রসঙ্গে উত্থিত প্রশ্ন মনে পড়ছে। সেটা হল "Is Perception an illusion? কথাটি শুনতে যত সহজ বাস্তবিকপক্ষে তা নয়। আমরা পাশ্চাত্য-প্রাচ্য উভয়বিধ মতবাদের সাহায্যে এই মতটির বিশ্লেষণ আলোচনা করব। পাশ্চাত্য মত নিয়ে শুরু করাই ভাল। পাঠক আধুনিক যুগে প্রাচ্য দর্শনের প্রাচীন মত ও বিশিষ্ট কাজগুলি নিয়ে মূলকিলে পড়তে পারেন।

আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে Perception কথাটির বা ক্রিয়াটির ব্যবস্থাও বিভিন্ন মতানুযায়ী করা যেতে পারে। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বার আছে। চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক এই ইন্দ্রিয়গুলির স্ব স্ব বিষয়ে কর্মপ্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুর সম্পর্কে মানুষের 'চোখ' (যদি তা খারাপ না হয়) প্রবৃত্ত হলে দেখা বা চক্ষুবিজ্ঞান বা Visual Perception হয়। চোখ থাকে অক্ষি-গোলকে ঠিকই। চোখের মণির ব্যবস্থানুযায়ী Iris বা দৃষ্টিদ্বারে গৃহীত আলো তার পশ্চাৎবর্তী তারল কনভেক্স লেন্সে আপতিত হয়। এই আপতিত হওয়া ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। দৃশ্য বস্তুটির লেন্সে উপস্থাপনা ঠিক ক্যামেরাতে যে ভাবে negative ধৃত হয় ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ একটা ফুল বা হাত বা মানুষ লেন্সে প্রথম আপতিত হবে উল্টোভাবে অর্থাৎ উর্দ্ধাংশ নীচে আধোভাগ উপরে। এক্ষেত্রে আমাদের দেখা উচিত দাঁড়ানো মানুষকে মাথার উপর দাঁড়ানো এবং পা উঁচুতে অবস্থায়। কার্যতঃ তা হয়না—যখন "দেখি" আমরা তখন সোজা অবস্থায় দেখি। এই ক্রিয়াটির নিহনকার যে সকল সক্রিয় Physiological অবস্থা ও Neurological অবস্থা আছে এবং চোখের মণিদ্বারা গৃহীত ও লেন্সে পতিত আলোক বিচ্ছুরণ সম্পর্কে Optic Physics যা বলে সেইসব জটিল তথ্যের সমাবেশে আমরা আপাতত যেতাম না। আলোকগ্রহণ, সে আলোর লেন্সে প্রতিফলন, প্রতিফলিত সে আলোর রেটিনায় স্নায়ুকোষে (রড ও কোন সেল) জাগানো কম্পন এ পর্যন্ত সবকটি প্রক্রিয়াই Visual Sensation-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর কোনওটাতেই তো একটা দাঁড়ানো মানুষ দেখিনা। অথচ কেন দাঁড়ানো মানুষ দেখি বা কী করে দেখি সে সম্বন্ধে কোনও Physiologist, কোনও Physicist, কোনও ডাক্তার জিজ্ঞাসিত হলেও তাঁদের কাছে উত্তর থাকবে না। অথবা উক্ত ক্রিয়াগুলির টুকরো একত্র করলে দাঁড়ানো সোজা মানুষ দেখা যাবেনা।

মনোবৈজ্ঞানিকের কাছেও খুব সন্তোষপ্রদ উত্তর নেই। এই যে চক্ষু গোলকের দ্বারা গৃহীত আলোর উপকরণ পাওয়া গেল তার বার্তা গ্রহণ করে চক্ষু সংবেদক স্নায়ুজাল। এখন পর্যন্ত শুদ্ধমাত্রিক

খোঁজাখুঁজি করে তার ভেতর দুটি অংশ পাওয়া গেছে। সামনেকার অংশটা ফ্রন্টাল লব; তারপরে প্যারাইটাল লব। একেবারে পিছনে থাকে অক্সিপিটাল লব এবং দুই পাশে সংস্কৃত অংশ টেম্পোরাল লব। যখন এই সম্ভাস্তরে অক্সিপিটাল লবই চক্ষু গোলকের দ্বারা গৃহীত আলোর উদ্দীপনের বিশ্লেষণ সমীকরণ হয় এবং তারপর মৌলিক উপস্থাপন ঘটে। শেষোক্ত প্রমাণের ফলে আমরা অবহিত হই যে আমরা দাঁড়ানো মানুষ দেখলাম। এতক্ষণে অর্থবোধ হল। কিন্তু Perception এই অর্থবোধক ও পূর্বোল্লিখিত Sensation কী এক? এই দুটির মধ্যে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ যোগটি আমরা কী ভাবে পেতে পারি বা বুঝতে পারি তা শুধু মেনে নিতে হয়—কিন্তু বোঝা বা বোঝানো যায়না। মনস্তত্ত্বের বলা যায় Sensation-টি মূলতঃ শারীর এবং পরবর্তী ক্রিয়াটিতে শারীর-মানস দুইই একত্রিত।

এখন দেখা যাক এই মানস ক্রিয়াটিই বা কী? ফলতঃ এরও আধার সেই স্নায়ুতন্ত্র। এই স্নায়ুক্রিয়া সমধিক জটিল এবং ব্যাপক। এই জটিল ব্যাপক স্নায়ুতন্ত্র ক্রিয়াটি পূর্বাপেক্ষ্য-সূত্রে পরম্পরাগত ভাবে Sensation থেকে গৃহীত, বিশ্লেষিত তথ্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হ'তে হ'তে পারস্পরিক সম্পর্কযোগে অন্যোন্য নির্ভর হয়ে থাকে। অতএব এদিক দিয়ে Perception যেমন Sensation থেকে প্রাপ্ত একথা না বলে বলা উচিত হবে একটি ক্রিয়া শুরু হয় Sensation-এ এবং Perception হল সেই ক্রিয়ারই ছেদহীন অপরোক্ষ সমাপ্তি।

আবার ঐ পূর্বোক্ত জটিল ও ব্যাপক স্নায়ুতন্ত্র ক্রিয়াটির বা ক্রিয়াগুলির কিছু ভিন্ন নামও আছে। অন্যোন্যনির্ভর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশিষ্টতাকে আমরা স্মৃতি নাম দিই। স্মৃতি ক্রিয়াটিতে অবশ্য তিন প্রকার ঘটক্রিয়া আছে। (সবটি ঠিক অর্থবহ হবে কিনা জানি না) স্মৃতি পাশ্চাত্য দর্শনেতে Apperception বা Mass Apperception বলা যায়। বৌদ্ধ দর্শনে তাকে স্মৃতি এক সংস্কার বা অভিজ্ঞ বহু অভ্যাস (Conditioning বলা চলে না)। স্মৃতি যতে স্মৃতি অপ্রমা, কারণ স্মৃতিলব্ধ যে জ্ঞানরূপ ক্রিয়া তা মুক্তবস্তুবোধক নয় এবং স্মৃত্যুপহিতত্ব অবাধিত নয় (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত স্পষ্ট নয় বরং বিষয়াশ্রয় ও সংশয়যুক্ত)। বর্তমানে স্মৃতিসামান্যকে আমরা এক প্রকার reference জ্ঞান বলব। আমাদের Perception-কে যদি প্রত্যক্ষ বলি তবে সে প্রত্যক্ষ সতত স্মৃতি-প্রমাণিত। যদ্যপি প্রতীতি হয়না যদি তা স্মৃতিআধারিত সামান্যজ্ঞানের কাছে না তুলিত হয়। অর্থাৎ, একটি পশু, ধরা যাক একটি গরু চোখে পড়ল—আর Sensation হল যেমনটি আগে বর্ণনা করে এসেছি। এখন গো সামান্য বা Apperception association বা আমাদের প্যারাইটাল লবে অংশতঃ এবং দুই টেম্পোরাল লবেও আধারিত, সেই স্থলে একপ্রকার তুলনাক্রিয়া বা reference সাধিত হল। এবার সমুদ্ভূত গো-প্রত্যক্ষজ্ঞান+পূর্বাহৃত সমূহ গোপ্রত্যক্ষ সামান্যজ্ঞান একত্র হল। এরই সাথে চিহ্নিত প্রত্যয়ে গো+গো প্রত্যক্ষ+গো সামান্য+গোপ্রত্যক্ষসামান্য মিলিয়ে আমরা একটি বাক্যে প্রকাশিতব্য ঘটনাকে উপলব্ধি করছি যে এটি একটি গরু। এটি একটি গরু মানে হল এই অর্থাৎ বস্তুটি সামান্যতঃ অগোসামান্যতা বিশিষ্ট অন্য অপেক্ষা ভিন্ন গোত্ব সামান্যতা বিশিষ্ট অন্য বা গরু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্মৃতি আধারিত—স্মৃতি ক্রিয়াতে থাকে পূর্বাহৃত সামান্যতা ও তার তুলনীয়তা এবং

তুলনীয় বস্তুটির পরিচয় বা অবক্ষেপ (Recognition)। এতক্ষণে বস্তু প্রত্যক্ষ রূপ আমরা পেলাম। এটা চোখে দেখা, কানে শোনা, জিভের স্বাদ, গন্ধ পাওয়া ও স্পর্শ পাওয়া সবরকম হতে পারে। কিন্তু প্রতি প্রক্রিয়াই Sensation দিয়ে আরম্ভ এবং যদি Perception is an illusion বলা যায়—তা মিথ্যাও হয়না আবার সত্যও হয়না। অনুরূপভাবে Perception is a meaningful sensation বাক্যটির অর্থও ভালো ভালো ভাবে আমরা বুঝে নিতে পারি এই মাত্র।

পূর্ববর্ণিত প্রত্যক্ষ পক্ষের মধ্যে লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন। চোখ দিয়ে দেখা প্রক্রিয়া, কান দিয়ে শোনা প্রক্রিয়া আবার ও পক্ষির স্নায়ুজাল ভেদে অবশ্যই ভিন্ন। তাসত্ত্বেও অভ্যাস ও conditioning বশতঃ চক্ষু কর্ণের একত্র ক্রিয়া স্পষ্টতর। অপর পক্ষে একটির অভাবে অন্য ক্রিয়াটি তীব্রতর লক্ষিত হতে পারে। স্বাদ ও গন্ধ নেওয়া প্রক্রিয়া দুটি প্রায় মিলেমিশে যায়। যেমন চক্ষু ও নাক বন্ধ করে খেলে আমুর কুচি পেঁয়াজের কুচির জ্ঞানে তাৎক্ষণিক বোধ না হতে পারে। তবে এটা সামান্যীকৃত হয়না। কারণ দু'স্থানে স্পর্শ ক্রিয়াটি বিভিন্ন। গন্ধ পাবার স্থান ও স্বাদ পাবার স্থান উভয়ই একটা প্রাণীদেহেই স্পর্শজ্ঞানসম্পৃক্ত। স্পর্শনক্রিয়া সর্বদেহব্যাপী—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা খুব সম্ভব আপন আপন বিশিষ্টতা নিয়ে ত্বগিন্দ্রিয় থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকবে প্রাণীজগতের বিকাশ ও বিবর্তনের ধারায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও দুরকমের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কথা বলা হয়—একটি হল Kinaesthetic বা Muscle Perception এবং অন্যটি হল Sense of Balance। শেষেরটির আবার কান দুটির ভিতর তার তিনটি করে Semicircular Canals আছে তদ্বিহিত স্নায়ুক্রিয়ায়। আর প্রথমটি বিকীর্ণ হয়ে আছে সারা দেহব্যাপী Motor neurones-এ ক্রিয়াতে।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে দুটো কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত এ তাবৎ আমরা কতকটা অস্পষ্ট অনুমানের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াটির অর্থ নির্বাচন করেছি। এখন সেই ক্রিয়াকে উপলব্ধি করছি স্নায়ুক্রিয়াআধারিত এবং স্নায়ুক্রিয়ানিয়ন্ত্রিত বলে। এজন্য জীবদেহ তথা মানবদেহ চিরে ফেড়ে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড স্নায়ুজাল সহ জড়িত সর্বদেহব্যাপী স্নায়ুতন্ত্রের একটা সাধারণ জ্ঞান আমাদের দরকার। অন্যান্য উন্নত দেশে মনোবিজ্ঞানে ডাক্তাররাই বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞান এসব কাটা ছেঁড়ার দিকে যায়ইনা। Clinical Psychology বা Medical Psychology মাত্র এদিকটায় প্রসারিত। দ্বিতীয়তঃ আর একটি কথা। স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া বলেই আমল ক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা হয়না এমনকি Perception বা প্রত্যক্ষেরও নয়। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলি একজনা মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক পরম উৎসাহে তাঁর ক্লিনিক্সের বিদ্যার্থীর সহকর্মীকে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কবিতাটি পড়ে শোনালেন। প্রথম অধ্যাপক যখন গভীর আবেগ ও প্রক্ষোভ নিয়ে (সর্বাঙ্গ-ব্যাপী স্নায়ুক্রিয়া সহ) কবিতাটির রসাস্বাদ নিজে করে অপরকে করাতে চাইছেন, তখন দ্বিতীয় অধ্যাপক বল্লেন—"তাইতে কী হইল ? কয়টা বক মি উইড়্যা গেল !" উপর্যুক্ত উদাহরণটিই যথেষ্ট স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় স্নায়ু আধারিত ক্রিয়া অথবা শুধু Conditioned Reflex মাত্র বলে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু বা ঘটনার পূর্ণ পরিচয় হয়না। এমন কী মস্তিষ্কস্থ উক্ত স্নায়ুজালের ক্রিয়া বৈদ্যুত অথবা রাসায়নিক (physical বা chemical)-এ বিচারেও কোনও লাভ নাই। প্রত্যক্ষ মাত্রেই এত বিবিক্ত এত বিশিষ্ট,

এর তার Shades যে বস্তুতঃ তা অবশ্যই। এর কারণ এমন নয় যে প্রত্যক্ষ সবসময় ক্রিয়া নয়। কিন্তু তাকে illusion বলা যায় না কারণ যে প্রত্যক্ষ যেমন সবসময় তেমনই ঘড়িতে সাপ দেখার মত ক্রিয়াও সবসময়ই। কাজেই এক্ষেত্রে বস্তুতঃ ঘড়ি সাপ নয়। অথচ আমরা বিভ্রান্তিবশত সাপ দেখতে পারি—ভয়ও পেতে পারি। ভ্রান্তিবশে যা হওয়া পর্যন্ত ঘড়ি দেখি না—সাপই দেখি। এক্ষেত্রে চক্ষুর সবসময় সবসময়ে আভাসিত। ব্যাপারটি যথাক্রমে non observation ও mal observation দোষে দুষ্ট। প্রাচ্য দর্শনের দিক থেকে আপাতঃসত্য হিসাবে প্রতীয়মান এরূপ ক্রিয়াকে জ্ঞানতত্ত্ববিদগণ বলা হয়। আর, শাঙ্কর বেদান্ত মতে 'অনির্বচনীয় খ্যাতি' বলা হয়। পাশ্চাত্য মতে এরূপ প্রত্যক্ষ সত্য না ভ্রান্তি অর্থাৎ illusion কিনা তাই বিচার্য।

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ

লেখক, প্রকাশক : ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ডিরেক্টর, পাভলভ ইনস্টিটিউট এণ্ড হসপিটাল, কলিকাতা ৭০০ ০০৬
দাম : ৩০.০০ টাকা

ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে এক বিশেষ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের নানা শাখায় আজ বাঙ্গালা গ্রন্থ অপ্রাপ্ত নয়। তা সত্ত্বেও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটু অপ্রাপ্তি আছে। পরম্পরাগতভাবে দীর্ঘকাল ইয়োরোপ আমেরিকায় যে মনস্তত্ত্ব ও প্রয়োগিক মনস্তত্ত্ব আলোচিত হয়ে এসেছে সেটি প্রধানতঃ ফ্রয়েডীয় চিন্তাপুষ্ট। আমরা অনেকেই ভুলে যাই যে ফ্রয়েড ডাক্তার, নিউরোলজিষ্ট। তিনি বৈজ্ঞানিক Hypothesis (Motem psychosis) নিয়ে কাজ করেছিলেন। বিজ্ঞানের এসব বহু Hypothesis কালে পরিবর্তিত হয়, অথবা সুসংস্কৃত হয়। ইয়োরোপে আমেরিকায় তা যথাবিধিমে ঘটলেও দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে মনস্তত্ত্ব বলে অথবা মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রায়োগিকতা, চিকিৎসা বুঝতে গেলে ফ্রয়েডীয় free association রীতি অবলম্বিত হয় অথবা সোজাসুজি shock treatment করা হয়। দুঃখের বিষয় মনস্তত্ত্বের শিক্ষার্থী ও রোগীগণ একপ্রকার বদ্ধ মানসিকতার শিকার হয়ে থাকেন। আমরা আরও একটা কথা ভুলে যাই যে ফ্রয়েডের প্রায় সমসাময়িক পাভলভও নিউরোলজিষ্ট ছিলেন। আরপাদিত সময় থেকে সোভিয়েৎ সমাজসীমার মধ্যে এই বিশেষ মনীষীর মতবাদের বৈজ্ঞানিক উত্তরণ ও বিকাশ ঘটে। প্রায়োগিকতাসূত্রে পাভলভীয় রীতির বিশেষ ক্ষেত্র পাওয়া গেছে কলসুসী বলে লেনিনগ্রাদের কাছাকাছি সোভিয়েৎ দেশের একটি বিশিষ্ট গ্রামে। সেখানে অনুষ্ঠিত তত্ত্বের তথ্যভিত্তিক পরীক্ষণের সুবৃহৎ কর্মকাণ্ড আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সহ ১৯৬২ সালে আমারও দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান-এর কোনও সমাজবাদী বা সোভিয়েৎ রূপ বা পুঁজিবাদী রূপ হয় কিনা পাঠক তার বিচার করবেন। প্রভেদ হয়ত আছে। সেটা প্রায়োগিক সদিচ্ছা বা অসদিচ্ছার দেটা কখনও তত্ত্বগত বা আবশ্যিক নয়। এরূপ মানসিকতার ফলেই এতকালে পাভলভবাদকে সরাসরি সংলগ্ন করা হয় সমাজবাদ তথা মার্কসবাদের সঙ্গে যেটা ঠিক মনে হয়না। অনুরূপ ভাবে ফ্যাসিটলিষ্ট, সোস্যালিষ্ট প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গীকে একটা প্রিভিউটাইপ বলে গ্রহণ করাও একপ্রকার অবৈজ্ঞানিক অভ্যাস ও সংস্কার! আমাদের বোঝা দরকার যে তাতেও বিচ্ছিন্নতা আসে। (দ্রষ্টব্য লেখিকার 'মানবমনে' প্রকাশিত রচনা জাতিসত্তা জাতিমন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা)।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের পূর্বলিখিত অন্য একটি গ্রন্থের স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ড। গ্রন্থে আলোচিত স্বকীয় বিশিষ্টতার মূল্যবান কয়েকটি নিবন্ধ বিভিন্ন সময়োপযোগী ভাবে লেখার কয়েকটি 'মানবমনে' প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের নিজ ভূমিকায় বলা হয়েছে বিচ্ছিন্নতা কী ভাবে ব্যক্তি-জীবনে, সংসার

সমাজে, রাষ্ট্রচৈতন্যে সচেতন (বা অবচেতন বলাই সঙ্গত) ভাবে উপযুক্তীত হয়েছে এবং সংঘটক কারণ বলে তিনি বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তদুপরি আমাদের মনে হয়েছে যে প্রকৃতিগতভাবে মানুষ মাত্রই স্ব স্ব ক্ষেত্রে একক ও বিচ্ছিন্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে আপন জন্মসূত্র সংস্কারকে কর্মসূত্র দ্বারা প্রণোদিত করে। বুদ্ধি বা rationality-র সাহায্যে সে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের রূপায়ণে অংশ গ্রহণ করতে পারে। লেখক যে অসাধ্য সাধন ব্রতে ব্রতী, মনে হয়, এইরূপ একটা সার্বিক তত্ত্ব মনে রাখলে তাঁর বিচ্ছিন্নতা-বোধের আলোচনা অনেকটাই আরও স্পষ্টতর হত। হয়ত মানুষ হিসাবে লেখক, পাঠক ও আমরা বিচ্ছিন্ন সত্তা। তবু reason-ই সেখানে যান্ত্রিকটা যোগাযোগের পথপরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়—"কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার, কেহ বোঝে এক কেহ বোঝে আর, আলোয় মনে আলোয় আঁধার দিয়েছে যিনি।"

এই কথাটা না মনে রাখলে আলোচনা একপেশে হয়ে যাওয়া সম্ভব। এতদ্ভেদে যোগসাধনে বিতর্ক বিচার বলে দুটো শব্দ আছে। Reason প্রতিনিয়ত বিতর্ক তুলছে বিচার করছে। বাচ্যার্থে এখানে Thesis-Anti thesis ও synthesis কথাটা ভেবে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর জটিলতা এখনকার মত না থাকলেও মানব মন ও মানব মনন তখনও পথ খুঁজত। আমাদের মেনে নিতে হয় যান্ত্রিকটা বিচ্ছিন্নতা আছে যান্ত্রিকটা আমরা দূর করতে পারি এইমাত্র। প্রভেদটা জটিলতায়। একদিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতশিল্পী গবেষক লেখক একযুথী, অনন্য।

তবু বিচ্ছিন্ন। তাদের অবদান তাঁদের যুক্ত করে সবার সঙ্গে নয়—যাঁরা যোগেন এমন কিছু সমমনস্কের সঙ্গে। এ যোগের প্রতিকারে আশাবাদী রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়—"যুক্ত করহে সবার সঙ্গে যুক্ত করহে বন্ধ।" আমার অন্য অসুবিধাও আছে। সুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি প্রসূত মননে বিচ্ছিন্নতাকে স্বকীয় মানুষকে অতিসৃষ্টি প্রণোদিত করতে পারে বৈকি। এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা এবং বিচ্ছিন্নতাকে কাজে লাগানো মূলতঃ একই মানসিক কারণের যুগ্ম বা যুক্ত ফল বললে ভুল হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে "সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শোষিত মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ সহজে তুলতে দিচ্ছে না। সর্বাত্মক পরিবর্তনকে বিঘ্নিত ও বিলম্বিত করছে"—এ উক্তিটির সার্বিক সত্যতা বাস্তবে মিলবে না। কথাটি অংশতঃ মাত্র সত্য। যন্ত্র যুগের স্বাধীনতা যুক্ত যেমনও এ-প্রকার অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিধান বা অন্যান্য ব্যবস্থা অনুকূল হলেও মানব মঙ্গল-রীতি বা Ethos এবং মানবসংস্কৃতি তথা মানবমননের উৎকর্ষ "হয়ত হাজার বৎসরে এক সিলিমিটার মাত্র বর্দ্ধিত হয়।" যাঁরা তা বলেন না তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদ আরও অন্য এক প্রকারের আশাবাদী মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থে আলোচিত প্রবন্ধগুলিকে আমি আমার নিজের বুঝবার সহায়তা হবে বলে একটু ছকের মধ্যে আনার প্রয়াস করেছি। এগুলি হল (ক) বা (A) : এর মধ্যে অন্তর্গত করেছি, জাতি, অভিজাতি, ঐক্য, অনৈক্য, সমন্বয়ের সূত্র ; মানব প্রকৃতি, শিশুমন দুর্বলচিত্ত চৈতন্যের সম্প্রদায়, সুরাসক্তি একটি সার্বকালিন সমস্যা নিবন্ধগুলি। (খ) বা (B) : এর মধ্যে বিন্যস্ত করেছি প্রক্ষোভ প্রসঙ্গে ১, প্রক্ষোভ প্রসঙ্গে ২, প্রতীকের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য, আত্মহত্যা, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ ; (গ) বা (C)

শীর্ষকে থাকবে, বিচ্ছিন্নতা বর্ষ ও পরিবারে ; বিজ্ঞান ও অন্যান্যবাদ, প্রলয়ের প্রলাপ, বিলয়ের অভিভাষন সাম্প্রদায়িকতা, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বর্ণাশ্রমী মানসিকতা বনাম শ্রেণীচেতনা ; (খ) বা (D) শীর্ষকে অর্ন্তভুক্ত হবে অমতা ও বিচ্ছিন্নতা, ক্যাসিবাদের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি, ক্যাসিবাদীর মন, মানুষ ও সমাজ। মার্কসবাদ ও নৈতিকতা। শেষটি (ঘ) উপসংহার। এইভাবে দেখলে, জাতি অভিজাতির বিভাগবিবেচন, ও মানুষ প্রকৃতির পরস্পরের সমাজীকরণ সম্বন্ধে ধারণা হয়। তারপর আসে নিজস্ব চেতনার দূর প্রসারণ ও একটি সামাজিক ব্যক্তিক সমস্যা সুরাসক্তি। মানবমনে প্রক্ষোভ বা Emotion / আবেগ বড় কথা। তবে সেটাই শুধু Romantic প্রেম কিনা এবং Romantic প্রেমের আলোচনা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে প্রেম বর্ম, আচরণাদি প্রতীকধর্মী। সুতরাং প্রতীকের আলোচনা ও তৎসম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের স্বরূপ নির্ণয় একটি ভাল সংযোজন। সবচেয়ে বেশী নিবন্ধ হল আত্মহত্যা ও তার সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কারণ। মূলতঃ আত্মহত্যার পিছনে প্রক্ষোভ একটা বড় কারণ। এর পর বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে ধর্ম ও পরিবার, বিজ্ঞান ও অন্যান্যবাদ, প্রলয়ের প্রলাপ, বিলয়ের অভিভাষন, গণহিষ্টিরিয়া একটি আলেখ্য, ও গণহিংসার অভিব্যক্তি ; সাম্প্রদায়িকতা—মনস্তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বর্ণাশ্রমী মানসিকতা বনাম শ্রেণীচেতনাকে আমরা আংশিকভাবে (গ) শীর্ষকে সন্নিবিষ্ট করলাম। পরিশেষে আসে অমতা ও বিচ্ছিন্নতা, ক্যাসিবাদের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা ক্যাসিবাদীর মন, মানুষ ও সমাজ এবং একটি উপসংহাররূপে লিখিত বা গৃহীত মার্কসবাদ ও নৈতিকতা। এভাবেই পারম্পর্য লেখাগুলির মধ্যেই আছে। আমরা শুধুমাত্র অর্থবোধক উপস্থাপনা করলাম যাতে লেখাগুলির মধ্যকার তীব্রগতিও ব্যাহত হয়না এবং গতিপথও অবিচ্ছিন্ন থাকে। মনে হয় লেখক নিজেই পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে মন দেবেন।

স্বাভাবিক কারণেই বলা যায় লেখক বিজ্ঞানী এবং মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানকে এক বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অভ্যাস করেছেন। এই ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা এসে যায়। মার্কস (বা পরবর্তী কালে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে লেনিন) পাশ্চাত্যীয় পদ্ধতির মনস্তত্ত্ব চর্চাকেই একমাত্র পথ বলেননি বা ঠিক এইভাবে বিষয়গুলির অবতারণা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। মূলসূত্র হল একটা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষা বা বিজ্ঞান দৃষ্টি (তা সে যেখানেই হক বাস্তবমুখী) মার্কসীয় পদ্ধতিরই পরোক্ষ অনুসৃতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই পরোক্ষ অনুসৃতি হয়ে ওঠে অপরোক্ষ অনুকৃতি। সেটা তো সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়না। সর্বত্রগামী বিজ্ঞান কি আছে ? সুতরাং মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানদৃষ্টি ও অন্যান্য বিজ্ঞানের থেকে পৃথক অন্ততঃ কিছুটা পৃথক হওয়া সম্ভব। যেমন H_2O সর্বত্র এক-ভাবে বোধগম্য হবে কিন্তু কতিপয় বিক্রেম্য কতকাংশে মাত্র গৃহীত হবে। কারণ, মানবীয় সকল অনুকৃতির সামগ্রিক ক্ষেত্রে এই নিউরোজিক্যাল (ফিজিওলজিক্যাল মনের বিজ্ঞান) বিওরীর সঙ্গে বিহেভিয়ারাল সাইকলজির একটু বিস্তার ভেদ হবেই। অপর দিকে গুরুমতিষ্কের আবির্ভাব, মতিষ্ক বন্ধনের জটিলীভবন, বিবর্তনবাদের এতদিনকার শর্তসাপেক্ষতার সঙ্গেই সর্বত্র মানান হেসে গৃহীত হতে পারে। তখন শুধুমাত্র মার্কসবাদ কথাটি প্রয়োগ করলে একটু বিচ্ছিন্নতাবাদের আভাস লক্ষ্য না করে পারা যায় না। তবে এসকল কথার উপরে যে কথা নির্দ্বিধায় স্বীকর্তব্য তাহলো তাঃ গঙ্গোপাধ্যায় মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন

প্রবর্তিত সমাজবাদ সহ পাশ্চাত্যীয় তন্ত্র ও তথ্যের একটা সমন্বয় করার পথে চলেছেন। এখনও পর্যন্ত একমেবদ্বিতীয়ম এই পুরোধা প্রবর্তক এবং তৎপরানুসারী চিকিৎসাপ্রথার একমাত্র অধীশ্বরও বটে। তাঁর প্রয়োগরীতিতে তিনি অভিজ্ঞায়ন প্রণালী দিয়ে সক্রিয় ও মানবীয় করে তুলেছেন। তাঁর এ কৃতিত্বে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত। তবে কথা হলো ব্যক্তিক রোগনির্ণয় এবং সামাজিক রোগপরীক্ষা কতখানি পরস্পরের সহায়ক হতে পারে তা আমার জানা নেই। অথচ সাধারণ মানুষ হিসাবে আশাবাদ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না বলে মনে করি বলেই এপর্যন্ত অর্থাৎ আপাততঃ বস্তুসৃষ্টির (সচেতন বিজ্ঞানসৃষ্টির) আশা ও আশ্বাসের কথা মনে রেখে ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বহৎপ্রয়াসী গ্রন্থটিকে অভিনন্দন জানাই। তাঁর বাঙলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট দিকটিতে পরীক্ষানিরীক্ষা সহ আরও মানুষ এগিয়ে এসে তাঁর আরব্ধ কাজকে সম্প্রসারিত করবেন এই আশা নিয়ে তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। বইখানি তিনি হালদার দম্পতিকে উৎসর্গ করে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন ও অর্হাহ।

শ্রীমতী অরুণা হালদার

With best compliments from :

CALCUTTA DIAGNOSTIC CENTRE

15/1, Hungerford Street,

Calcutta-17

Branch :

CALCUTTA SCAN CENTRE

BAGHBAZAR

MASIK BASUMATI
Vol. 27, No. 2

Regd. No. 8570/62
Office of the Registrar of Newspapers for India

Price Rs. 5.00
দাম ঃ ৫.০০

সম্পাদক : শারদীয়া বসুমতী